সরকারি বিজ্ঞাপন নীতিমালা

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু

g¨vm-jvBb wgwWqv †m›Uvi Ges mvßvwnK 2000-Gi †hŠ_ D‡`¨v‡M ÔmiKvwi weÁvcb bxwZgvjv: ms¯v‡ii c‡qvRbxqZv KZUKÕ kxlK GK bxwZ msjv‡ci Av‡qvRb Kiv nq 16 gvP, †ejv 11Uvq RvZxq †cmKv‡ei Kbdv‡iÝ i“‡g| †mB bxwZ msjv‡ci we‡kl †µvocÎ

কামরুল হাসান মঞ্জু : আজকের এই আয়োজনের জন্য দেশের প্রায় সব পত্রিকার সম্পাদক ও বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এর মধ্যে অনেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত যারা এসে উপস্থিত হতে পারেননি, আমি আশা করবো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে আজকের আলোচনায় অংশ নিয়ে আমাদের সহযোগিতা করবেন। যেহেতু হাতে সময় খুব অল্প সেজন্য আমি গোলাম মোর্তোজাকে তার 'সরকারি বিজ্ঞাপন নীতিমালা : সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করার মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

গোলাম মোর্তোজা : পুরো প্রবন্ধটি নয়, অংশ বিশেষ পড়ছি। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রায় সব তথ্য নিয়ে পূর্বে সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে সংবাদপত্র। বাড়ছে সংবাদপত্রের সংখ্যা। সাংবাদিকতা পেশায় আসছে পেশাদারিত্ব। এর বাইরে নীরবে ঘটছে কিছু ঘটনা। মূলত সরকারি বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হচ্ছে শতাধিক সংবাদপত্র। বছরে কয়েক কোটি টাকার সরকারি বিজ্ঞাপন পাচ্ছে এই সংবাদপত্রগুলো। সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে, সরকারি বিজ্ঞাপন পাবে এতে কারোরই কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এটা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই হওয়ার কথা। কিন্তু বিষয়টি মোটেই স্বাভাবিক নয়। কেন স্বাভাবিক বলছি না সেটা বোঝার জন্যে আমাদের জানা প্রয়োজন হয় এই পত্রিকাগুলোর নাম। দৈনিক বঙ্গজননী, দৈনিক নয়া জামানা, দৈনিক সত্যাচার, আজকের প্রত্যাশা, আজকের জীবন, নব সূর্যোদয়, কিষান, নওরোজ, ভোরের কণ্ঠ, বিরল, খোলা কাগজ, গণমুক্তি, সবুজ নিশান, প্রথম প্রহর, জনপদ, অজানা, ভোরের আকাশ, প্রথম সূর্যোদয়, অপরাধ কণ্ঠ, ইনসানিয়াত, নবকণ্ঠ, ইশতেখলাল, আজকের পদ্ম, খোলা বাজার, আজকের অমৃত বাজার, ঢাকার ডাক, একুশে সংবাদ, প্রথম কাগজ, সত্যের আলো, সোনার আলো প্রভৃতি। মানুষ এই পত্রিকাগুলোর নাম জানে না। এক একটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ৫০ থেকে ৬০ কপি। কোনো কোনোটির আরো কম। এই আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলো সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা পেশার ভাবমূর্তির জন্যে রীতিমতো হুমকি স্বরূপ।

● একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা দিনে ডিএফপি থেকে কমপক্ষে ৩০ ইঞ্চি পরিমাণ বিজ্ঞাপন পায়।

● ডিএফপি'র নীতিমালা অনুযায়ী সর্বনিম্ন রেট প্রতি ইঞ্চি ১০৪ টাকা হিসেবে প্রতিদিন ৩ হাজার ১২০ টাকা আসে এই বিজ্ঞাপন থেকে।

● শুধু ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন থেকে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার মাসে আয় ৯৩ হাজার ৬০০। এ ছাড়া অর্থঋণ আদালত, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, রাজউক, ডেসা প্রভৃতি সরকারি সংস্থা থেকেও মাসে উল্লেখযোগ্য হারে বিজ্ঞাপন পায় এ সব পত্রিকাগুলো। এর

Wb t_‡K মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, মাহফুজ আনাম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কামরুল হাসান মঞ্জু, গোলাম মোর্তোজা

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন যারা

■ **ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী,** শিক্ষাবিদ
■ **মাহফুজ আনাম,** সম্পাদক, ডেইলি স্টার, প্রকাশক, সাপ্তাহিক ২০০০
■ **গিয়াস কামাল চৌধুরী,** সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
■ **মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল,** নির্বাহী সম্পাদক, সংবাদ
■ **ফরিদ হোসেন,** ব্যুরো চিফ, এপি
■ **কামরুল হাসান মঞ্জু,** নির্বাহী পরিচালক, এমএমসি
■ **ড. আসিফ নজরুল,** সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
■ **শামীম রেজা,** প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
■ **খোন্দকার সাখাওয়াত,** গবেষক, পিপিআরসি
■ **খোন্দকার আলী আশরাফ,** সহকারী সম্পাদক, যুগান্তর
■ **এরশাদ মজুমদার,** সাংবাদিক
■ **শেখ রকিব উদ্দিন,** সাংবাদিক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট
■ **ফরহাদ চৌধুরী,** জেনারেল ম্যানেজার, আজকের কাগজ
■ **রুদ্র মাসুদ,** বেগমগঞ্জ প্রতিনিধি, যুগান্তর
■ **রবিউল,** গবেষণা বিভাগ কর্মী, এমএমসি
■ **গোলাম মোর্তোজা,** নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক ২০০০

পরিমাণও মাসে ৫০ হাজার টাকার নিচে নয়।

● মাসে সর্বনিম্ন হিসাবেই শুধু ঢাকার ১৫০টি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার বিজ্ঞাপন বাবদ ডিএফপি থেকে পরিশোধ করা হয় ১ কোটি ৪০ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

● বছরে পরিশোধ করা হয় ১৬ কোটি ৮৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

● এই পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকের চেয়ে অনেক বেশি। দেখা যায় প্রথম শ্রেণীর ২০টি জাতীয় দৈনিকে গড়ে ৫০ ইঞ্চি করে বিজ্ঞাপন দেয়া হলে মাসে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা প্রতি ইঞ্চি হিসাবে এই বিজ্ঞাপন বাবদ মোট পরিশোধ করতে হয় মাসে ৯০ লাখ টাকা। বছরে পরিশোধ করা হয় ১০ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

● অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলোকে প্রায় ৬ কোটি টাকার বেশি বিজ্ঞাপন দেয়া হয় ডিএফপি থেকে।

● গত ডিসেম্বর মাসে ডিএফপি'র এক কর্মকর্তার আন্ডারগ্রাউন্ড সিন্ডিকেট হিসেবে খ্যাত শুধু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে ২২ হাজার ৮১৯ ইঞ্চি সরকারি বিজ্ঞাপন এবং ৪ হাজার ৯৩৩ ইঞ্চি আধা সরকারি বিজ্ঞাপন, সব মিলিয়ে ২৭ হাজার ৭৪৩ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন।

● জানুয়ারি মাসে এই ২৩টি পত্রিকা বিজ্ঞাপন পেয়েছে ২০ হাজার ৫৬৪ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন এবং আধা সরকারি ৬ হাজার ২৯১ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন, মোট ২৬ হাজার ৮৫৫ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন।

● দুই মাসে মোট বিজ্ঞাপন পেয়েছে ৫৪ হাজার ৫৯৮। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন এই ২৩টি পত্রিকার প্রতিটি পত্রিকা বিজ্ঞাপন পেয়েছে ৩৯ দশমিক ৫৬ ইঞ্চি।

● যেসব পত্রিকা এই হারে বিজ্ঞাপন পেয়েছে সেগুলোর নাম সম্ভবত বাংলাদেশের শতকরা ১ ভাগ পাঠকও জানেন না। এই পত্রিকাগুলোর নাম লেখার শুরুতে উল্লেখ করেছি। এই পত্রিকাগুলো দিনে গড়ে প্রায় ২০টি করে বিজ্ঞাপন পেলেও গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সংসদের প্রশ্নোত্তরপর্বে তথ্যমন্ত্রীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলোর মধ্যে দৈনিক প্রথম আলো ২০০৩-০৪ অর্থবছরে পেয়েছে মোট ৫১০টি বিজ্ঞাপন এবং দৈনিক যুগান্তর পেয়েছে ১ হাজার ১৬৬টি বিজ্ঞাপন। দেখা যায়, প্রথম আলো গড়ে দিনে একটি এবং যুগান্তর দিনে তিনটি করে বিজ্ঞাপন পেয়েছে। এছাড়া এ বছরে দৈনিক জনকণ্ঠ কোনো সরকারি বিজ্ঞাপন পায়নি।

● অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিজ্ঞাপন পাওয়া দৈনিক দিনকাল, ইনকিলাব ও সংগ্রাম ছাড়া আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলোই অধিকাংশ সরকারি বিজ্ঞাপন দখল করে রেখেছে।

● ডিএফপি'র দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা সরকারি আদেশ সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনটি প্রথম আলোতে পাঠায় না। তারা বাজার থেকে নির্দিষ্ট তারিখের একটি প্রথম আলো কিনে ভেতরের কোনো পাতায় বিজ্ঞাপনটি পেস্ট করে ওই পাতা আবার নতুন করে ছাপায়।

● গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে আজকের প্রত্যাশা পত্রিকা বিজ্ঞাপন পেয়েছে ২ হাজার ৮৩৩ ইঞ্চি এবং ২ হাজার ৯২৬ ইঞ্চি। আজকের জীবন পত্রিকা এই দুই মাসে বিজ্ঞাপন পেয়েছে ২ হাজার ৬২ ইঞ্চি এবং ২ হাজার ৭৬৬ ইঞ্চি। অর্থাৎ আজকের প্রত্যাশা গড়ে প্রতিদিন ৯৬ ইঞ্চি এবং আজকের জীবন ৮১ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন পেয়েছে। অথচ সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এ দু'টি পত্রিকার এক ইঞ্চি বিজ্ঞাপনও পাওয়ার কথা নয়। কারণ

'বাংলাদেশের যে সাধারণ নীতি তা হলো লুণ্ঠণের, তা এখানেও আছে। আমাদের সমাজে যে শাসক শ্রেণী তৈরি হয়েছে তাদের সংঘর্ষ আজকের রাজনীতি। যে সরকার যখন ক্ষমতায় আসছে তখন তারা বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করছে'

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শিক্ষাবিদ

নীতিমালায় স্পষ্ট বলা আছে কমপক্ষে ৬ হাজার প্রচার সংখ্যা না হলে ঢাকায় প্রকাশিত দৈনিকে কোনো বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না।

কাগজের নীতিমালা

● তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপন নীতিমালায় বলা হয়েছে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের ক্ষেত্রে প্রচার সংখ্যা কমপক্ষে ৬ হাজার, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিকের ক্ষেত্রে ৪ হাজার এবং খুলনা, রাজশাহী ও অন্যান্য স্থানের দৈনিকের কমপক্ষে প্রচার সংখ্যা ৩ হাজার হলে সরকারি তালিকাভুক্ত করা যাবে।

● অর্ধ-সাপ্তাহিক ও সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রে প্রচার সংখ্যা যথাক্রমে তিন হাজার, দুই হাজার এবং অন্যান্য স্থানের ১ হাজার প্রচার সংখ্যা হতে হবে।

● মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকার ক্ষেত্রে দেশের যে কোনো স্থানের জন্য কমপক্ষে ১ হাজার প্রচার সংখ্যা হতে হবে।

● এর পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠতা, উন্নয়ন কার্যক্রমে সমর্থন দান এবং ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়নের শর্তও দেয়া আছে নীতিমালায়।

● আন্ডারগ্রাউন্ড দৈনিক, সাপ্তাহিক কোনোটিরই প্রচার সংখ্যা একশ'র বেশি নয়, অন্যান্য শর্ত পূরণের প্রশ্নই আসে না। তারপরও এরা সরকারি বিজ্ঞাপনের জন্য তালিকাভুক্ত। কিভাবে তালিকায় আসে তা সবাই জানে। ডিএফপি'র কর্মকর্তারা এদের তালিকাভুক্ত করে দু'নম্বরি কায়দায়।

যা করণীয়

সরকারি অর্থের এত অপচয়ও হয়ত কোথাও এভাবে হয় না, ডিএফপির মাধ্যমে যেভাবে হয়। বহুবার প্রস্তাব উঠেছে ডিএফপি তুলে দিয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে বিজ্ঞাপন দেয়ার অধিকার দেয়ার জন্য।

● ডিএফপি'র মত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কি আদৌ আছে?

● প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোকে বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণের মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে এ বিষয়টি ভাবতে হবে।

● প্রায় এক বছর আগে সরকার ডিএফপির বিজ্ঞাপন বন্টন বিকেন্দ্রিকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো উদ্যোগ। উদ্যোগটি ছিল নিজ নিজ সরকারি প্রতিষ্ঠান ডিএফপি'র মাধ্যমে ছাড়া নিজেরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে।

● এই সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে একটি রিট করে বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ। এই সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন সরকারি দলের সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ।

● গত ৮ মার্চ এই রিট খারিজ করে দেয় আদালত। এখন আন্ডারগ্রাউন্ড চক্র প্রস্তুতি নিচ্ছে আপিলের। জানা গেছে, চাঁদা তুলে তারা একটি ফান্ড জোগাড় করেছে। এর বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোর উদ্যোগী হওয়ার সময় এসেছে। কিছু সংখ্যক অসৎ মানুষের হাতে মাঠ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার অর্থ হয় না। আর এসব আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার জন্য সুস্থ সাংবাদিকতার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, সাংবাদিকতা পেশার সুনামও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ

বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সাংবাদিকদেরও এগিয়ে আসতে হবে আন্ডারগ্রাউন্ড মিডিয়া সাম্রাজ্যের অপতৎপরতা বন্ধের জন্য।

মঞ্জু : ধন্যবাদ গোলাম মোর্তোজাকে 'সরকারি বিজ্ঞাপন নীতিমালা ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু' শীর্ষক প্রবন্ধের সার সংকলন আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। তার উপস্থাপনে আমরা কতগুলো বিষয় পেয়েছি, যে জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বিশেষ করে তিনি তার প্রবন্ধে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার বিজ্ঞাপন পাওয়ার যে কৌশল, সে সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ ছাড়া ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন নীতিমালার সঙ্গে বিজ্ঞাপন বিতরণের যে অসঙ্গতি, সে বিষয়টিও তার প্রবন্ধে এসেছে। বিশেষ করে মূলধারার যে পত্রিকাগুলো রয়েছে সেই পত্রিকাগুলো, যেগুলো যোগ্য, দক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য পত্রিকা; সেগুলোর বিজ্ঞাপন পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য এবং রাজনৈতিক যে প্রভাব সে বিষয়টিও তার প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক ধরনের সিন্ডিকেট গঠন এবং তার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার যে কৌশল সেটিও তুলে ধরা হয়েছে। এ অবস্থা বিদ্যমান থাকার জন্যই বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যোগ্য, মানসম্পন্ন পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন পাচ্ছে না। বিজ্ঞাপন নীতিমালার সঙ্গে যে অসঙ্গতিগুলো রয়েছে, সে বিষয়গুলো এখানে আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসবে। এ ছাড়া বিজ্ঞাপনের যে নীতিমালা রয়েছে তার যদি কোথাও সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে, সে ব্যাপারে যদি আপনারা পরামর্শ দেন তাহলে ভবিষ্যতে বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করা যাবে। আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত ডেইলি স্টারের সম্পাদক জনাব মাহফুজ আনামকে অনুরোধ করছি।

মাহফুজ আনাম : সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে আমাকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজকদের একজন বলতে পারেন। বিজ্ঞাপনের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে বহু কথা আমাদের হয়েছে। প্রথম প্রথম সবাই খুব উৎসাহ দেখায় কিন্তু পরবর্তীতে কেউ এগোয় না। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। কিছুদিন আগে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আমরা একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলাম। সেখানে দেখা যায় মাত্র ১২টি পত্রিকা ছাড়া কোনো পত্রিকা ওয়েজ বোর্ড মানে না।

আমি একজন সংবাদপত্র প্রকাশক হিসেবে বলতে চাই, এটা কিভাবে সম্ভব? আমি এখানে অন্য প্রসঙ্গ টানলাম। কেননা, আইন মোতাবেক সংবাদপত্র বের করতে হলে ওয়েজবোর্ড মানতে হবে। কিন্তু সরকার নিজেই বের করলো যে পত্রিকাগুলো ওয়েজবোর্ড মানছে না, তারপরও এ ব্যাপারে তাদের কোনো প্রকার পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না।

> 'এই ইস্যুটা শুধু সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের ব্যবসা, ভালো সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন পাবে কি পাবে না এটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে এবং বিশেষ করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত'
>
> **মাহফুজ আনাম**, সম্পাদক, ডেইলি স্টার, প্রকাশক, সাপ্তাহিক ২০০০

শুধু ১২টি পত্রিকা কেন ওয়েজ বোর্ড মানবে? ঠিক একই ব্যাপার ঘটছে সংবাদপত্রে সরকারি বিজ্ঞাপন দেয়ার যে নীতিমালা রয়েছে সেটার ক্ষেত্রে। এখন আপনাদের যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইছি, ১৩/১৪ কোটি টাকা আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলো নিয়ে গেলেও বিষয়টা শুধু এই কয়েক কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। আপনারা যদি চিন্তা করেন যে, এসব কাগজে কি কি ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়? এখন দেখা যায় এসব কাগজে সরকারি টেন্ডারগুলো ছাপা হয়। এই কোটি কোটি টাকার টেন্ডার ছাপার কারণ হচ্ছে বড় বড় ব্যবসায়ীরা এটা জানতে পারবে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে এবং তারা দরপত্র জমা দেবে। এখন এ সমস্ত টেন্ডার যদি এসব পত্রিকায় ছাপা হয়, তাহলে তো কেউ এটা জানতে পারবে না। কেননা, মোর্তোজা বলল, এসব পত্রিকার সার্কুলেশন ১০০/১৫০ কপির বেশি নয়। তাহলে এই টেন্ডারগুলো সম্পর্কে কারা জানবে এবং কারা এই টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করবে? এখানে সরকারের কাজের একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ সরকার যদি সুষ্ঠুভাবে একটি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে চায়, সে যদি সত্যিকার অর্থে এটা চায় যে একটি যোগ্য প্রতিষ্ঠান এই কাজটা পাক তাহলে কিন্তু এসব কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে যোগ্য প্রতিষ্ঠান আসবে না। এমনকি জানতেও পারবে না। অর্থাৎ শুধু এই ১৪ কোটি টাকাই অপচয় হচ্ছে না, বরং সরকারের পুরো উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। যার ফলে দেখা যায় প্রত্যেক বছর এডিপি বাস্তবায়িত হয় না। প্রত্যেক বছর সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় হয়। অর্থাৎ আমি যে পয়েন্টটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, এই ইস্যুটা শুধু সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের ব্যবসা, ভালো সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন পাবে কি পাবে না এটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে এবং বিশেষ করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এ কথাটা সরকার কেন বুঝতে পারছে না। এর ফলে গণতন্ত্রের উন্নয়ন প্রক্রিয়াটা ব্যাহত হচ্ছে। সরকার কি চায়? চায় প্রচার। কোনো কাজের টেন্ডারের বিজ্ঞাপন যদি এসব আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকায় দেয়া হয় যেসব পত্রিকার নাম কেউ জানে না, তাহলে ভালো কন্ট্রাক্টর কোথা থেকে আসবে? তাই একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ সুবিধা নিয়ে দুর্নীতি করছে। ডিএফপির অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার জন্য এসব দুর্নীতি বাড়ছে, সত্যিকারের কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না। তাই আমি মনে করি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের উচিত অবশ্যই ডিএফপির নীতিমালার পরিবর্তন করা। পাশাপাশি ডিএফপির জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং দেশের উন্নয়নের জন্য এটা খুবই জরুরি। এটা না করলে দেশের উন্নয়নের সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ।

মঞ্জু : ধন্যবাদ জনাব মাহফুজ আনামকে চমৎকারভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। বিশেষ করে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, সুষ্ঠু বিজ্ঞাপন বন্টনের সঙ্গে উন্নয়নের বিষয়টি জড়িত আছে। আমরা বিজ্ঞাপন বন্টন ও উন্নয়নের বিষয় নিয়ে কথা বলি কিন্তু এ জায়গাটি খতিয়ে দেখা হয় না। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ, গ্রহণযোগ্য কাগজ যে কাগজটি সবাই পড়ে এবং ভালো ব্যবসায়ীরা পড়ে, সেসব কাগজে বিজ্ঞাপন না দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এর ফলে পত্রিকার মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত টেন্ডার দেয়া হয় সেগুলো যারা পাঠক অর্থাৎ যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এ জন্য দেখা যায় অসাধুভাবে গোপন পথে টেন্ডার নিয়ে যে কারচুপি, কারসাজি সেটা ঘটে। এ জায়গাগুলো আলোচনায় আসে না এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি মাহফুজ আনাম একটি বিষয় বলেছেন যে, বিজ্ঞাপন

বন্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জায়গাটি নিশ্চিত করা দরকার। এটি যদি না করা যায় তাহলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেমন সংরক্ষণ করা যাবে না, তেমনি সংবাদপত্রের ভূমিকা রাষ্ট্রের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করাও সম্ভব হবে না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা তার কাছ থেকে পেয়েছি। এখন পিপিআরসি'র গবেষক খোন্দকার সাখাওয়াত। তাকে আমি আলোচনা করার অনুরোধ করছি।

খোন্দকার সাখাওয়াত : ধন্যবাদ। বিনয়ের সঙ্গে বলবো যে, আমি সংবাদপত্রের একজন পাঠক। একজন গবেষক, সমাজতাত্ত্বিক অথবা নাগরিক হিসেবে অবশ্যই আমার কিছু বলার আছে। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই আমার অনুজপ্রতিম গোলাম মোর্তোজাকে। মোর্তোজা গবেষক নয় কিন্তু গবেষকদের চিন্তা করবার মতো একটি গবেষণার ফ্রেমওয়ার্ক যেটা থেকে বিষয়টি ছোট থেকে বড় এবং বড় থেকে ছোট করে ভাববার অসাধারণ সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আমি একটু অন্যভাবে কথাটা আলাপ করতে চাই। সেটা হলো মোর্তোজা সমাজবিজ্ঞানে নতুন করে দুটি শব্দ আমাদেরকে উপহার দিয়েছে। যেটি বহুল পরিচিত শব্দ। এগুলো হচ্ছে সিন্ডিকেট এবং আন্ডারগ্রাউন্ড। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এটার সঙ্গে মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করা। এটা শুধু আজকে আমাদের দেশেই হচ্ছে না, এটা পৃথিবীব্যাপী ঘটছে। মিডিয়া একটি সিন্ডিকেট ভূমিকায় চলে গেছে। যেটি মাহফুজ আনাম বলার চেষ্টা করছিলেন এবং আমিও সেই জায়গাটিতেই আমার ভাবনাটা ছড়িয়ে দিতে চাই। আমাদের দেশের গোটা উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেই এক ধরনের সিন্ডিকেটিজম তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ একটি গোষ্ঠী অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা সামর্থ্য এবং রাজনৈতিক ম্যাকানিজম তৈরি করতে চেষ্টা করছে। এটি কেন হচ্ছে? এটি করা হচ্ছে গণতন্ত্রের জায়গা থেকে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে। আমি অসম্ভব সাহস দেখছি মোর্তোজার যে, সে নামগুলোও উল্লেখ করে দিয়েছে। একজন এমপির নাম উল্লেখ করেছে এই সিন্ডিকেট পত্রিকার হোতা হিসেবে। গত সরকারের যারা জড়িত ছিল তাদেরও নাম উল্লেখ করে দিয়েছে। আমি মনে করি এটা দুটি কারণে হচ্ছে। সুশাসনের সঙ্গে বিষয়টি জড়িত এবং মিডিয়া যে জায়গায় এসে আমাদের দেশের একমাত্র 'পিউপিলস আই' হওয়ার চেষ্টা করছে, সে জন্য এই সরকারের দু'জন মন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেছেন, গণতন্ত্রটা মনে হয় মিডিয়াকে বেশি দেয়া হচ্ছে। যে কারণে তারা এর অপব্যবহার করছে। এই কথার মাধ্যমে গণতন্ত্র সম্পর্কে তাদের যে ধারণা রয়েছে সেটার প্রকাশ পায়। শুধু বিজ্ঞাপন নয়, মিডিয়ার নিয়মনীতির প্রতি সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেটা বোঝা যায়। তাছাড়া এ থেকে তাদের গুণগতমানের মাত্রাটা কি পর্যায়ে রয়েছে সেটাও আমরা বুঝতে পারি। সরকারি বিজ্ঞাপনের দুর্নীতির ফলে শুধু উন্নয়ন প্রক্রিয়াকেই ব্যাহত করছে না, এটা জ্ঞান প্রক্রিয়াকেও ব্যাহত করছে। আমাদের দেশের শিক্ষক সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই দুর্নীতিটা আজ চরমভাবে দেখা দিয়েছে। যেমন- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনকে শিক্ষক পদে নেয়ার জন্য একটি অখ্যাত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে। যাতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা প্রথম হয়েছেন তারা যেন এটা জানতে না পারে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে সংবিধান আমরা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছি তার ৩৯ নং অনুচ্ছেদে অত্যন্ত সুন্দর একটি কথা রয়েছে- চিন্তার স্বাধীনতা। প্রজাতন্ত্র এখানে ওয়াদা করেছে। তাই আমরা চিন্তা ক্ষেত্রে স্বাধীন

গিয়াস কামাল চৌধুরী সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন

সে জন্য বিজ্ঞাপনগুলো অপরিচিত পত্রিকায় দিচ্ছে। তাই এটা শুধু এখন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ নেই। এটা জ্ঞানের ঐ জায়গাতেও যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের গোটা সমাজে এক ধরনের সংরক্ষণবাদের জায়গা তৈরি হয়েছে। সিন্ডিকেটিজম তৈরি হয় আসলে এক ধরনের সংরক্ষণবাদ বা গোষ্ঠীর স্বার্থের জাগয়া থেকে। এটা আমাদের রাজনৈতিক সমাজে একটি বৈচিত্র্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ আমরা বিজ্ঞাপন ও মিডিয়া ব্যবসার সঙ্গে দেখতে পাই। দ্বিতীয় যে জায়গটা সেটার একটা রাজনৈতিক অর্থনীতি তো আছে অবশ্যই। এই বিজ্ঞাপনগুলো টেন্ডারের সঙ্গে যুক্ত এবং আপনারা দেখবেন তিনজন মন্ত্রীর যে কথাটা প্রবন্ধে বলা হয়েছে, সেখানে একজন হচ্ছেন আমাদের ঢাকার মেয়র। আরেকজন হচ্ছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী। বিদ্যুতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশাল টেন্ডারগুলো হয় এবং এর সঙ্গে যে স্বার্থ সেটা শুধু রাজনৈতিক স্বার্থ নয়, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থগুলোও জড়িত। আমাদের দেশে যেটি ঘটে যাচ্ছে সেটি হলো রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক প্লেয়ার্সরাও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ কাজটি করছে। এই বিজ্ঞাপনগুলো বিশেষ করে জাতীয়-আন্তর্জাতিক টেন্ডারগুলোর সঙ্গে এই অর্থনৈতিক সম্পর্কটাকে আমাদের হিসাবে দেখতে হবে। সুতরাং আমি আজকে এ কথাটি বলতে চাই যে, মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কর্মকান্ড ঘটছে সেটা আসলে আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং অর্থনীতিরই একটি বহিঃপ্রকাশ। এটা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। ঘটনা পরম্পরায় আজকে এখানে এসেও বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। তৃতীয় যে বিষয়টা আমি বলতে চাই সেটা হলো, আপনারা তো দেখলেন একটি আন্ডারগ্রাউন্ড মিডিয়া ১৬ কোটি টাকা পাচ্ছে। যারা সর্বোচ্চ বিজ্ঞাপন পেয়েছে সেটাও প্রবন্ধে উল্লেখ করেছে। সেখানেও কিন্তু একটি রাজনৈতিক প্রভাব স্পষ্ট পাচ্ছি। দৈনিক দিনকাল, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম এই পত্রিকাগুলো ২০০৩-০৪-এ সর্বোচ্চ বিজ্ঞাপন পেয়েছে। আমি একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে তিনটি পত্রিকা দেখার সুযোগ পাই। আমি আজকে তিনটি পত্রিকা দেখে এসেছি বিজ্ঞাপনের জায়গা থেকে; একটি ডেইলি স্টার, একটি প্রথম আলো এবং আরেকটি হচ্ছে আমার দেশ। একজন নাগরিক হিসেবে স্পষ্ট চিত্রটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পত্রিকাগুলোর বিজ্ঞাপন পাওয়ার ক্ষেত্রে। আরেকটি জায়গা, যেটাকে আমি বলবো সম্ভাবনার জায়গা। যে পত্রিকাগুলো জনগণের পাশে দাঁড়াচ্ছে সেগুলো আসলে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে বলেই সরকারের বিরুদ্ধে নয় বরং নাগরিকের পক্ষে এবং দেশের স্বার্থে কথাগুলো বলতে পারছে। সেখানে প্রাইভেট সেক্টরে একটা বড় ধরনের উন্নয়ন হয়েছে এবং প্রাইভেট সেক্টরের একটা পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েই তারা কথা বলতে পারছে। সুতরাং এদিক থেকে আমরা আরেকটি জায়গা পাচ্ছি যেখানে একটি ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতার সুযোগ আছে। কেননা, প্রাইভেট সেক্টরগুলো তাদের নিজস্ব স্বার্থেই যে সমস্ত পত্রিকা বহুল প্রচারিত তাদেরকে ব্যবহার করতে পারে। আরেকটি

বলবো, সৃষ্টিশীল কাজে অংশগ্রহণ। যারা আমাদের চোখের আড়ালে, তাদের নিয়ে আর বেশি কথা বলতে চাই না। কারণ ওটা তো হতাশার জায়গা। আশার জায়গায় দু-একটি কথা আমি বলতে চাই। এখন বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রগুলোর সৃষ্টিশীল কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। যেগুলো সৃষ্টিশীল কাজে বিজ্ঞাপনকে ব্যবহার করতে পারছে সেগুলোর মধ্যে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার কিংবা সংবাদও মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করছে। এই তিনটি পত্রিকা সামাজিক উন্নয়ন সাধনের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সৃষ্টিশীল কাজে অংশগ্রহণ করছে। যেমন গণিতের বিষয়, ভাষার ক্ষেত্রে, এসিডদগ্ধের বিষয়, বাজেটের বিষয়, সংবাদ যেটি করে (অন্তজনের বাজেট, যেটি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে করেছে) কিংবা ডেইলি স্টার করেছে 'এডুকেশন ওয়াচ' নিয়ে। এটিও আরেক ধরনের অংশগ্রহণ। এই তিনটি বিষয় বলে আমি সার সংক্ষেপ হিসেবে যে বিষয়টা বলতে চাই সেটা হলো যে নীতিমালা আছে সেটিও দেখবেন যে অনেক পুরনো। সুতরাং নীতিমালা পরিবর্তিত হওয়া দরকার। আমার মনে হয় সরকারের এই বিভাগটি ঐতিহাসিকভাবেও তার সামর্থ্য হারাচ্ছে এবং সেখানে লাভের জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেটা সরকারই বিকেন্দ্রীকরণ করেছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, গোষ্ঠী স্বার্থের কারণে তারা সেখান থেকে সরে এসে তার বিরুদ্ধে রিট মামলা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। পত্রিকাগুলোর ও নাগরিকদের স্বার্থে এখানে মনে হয় পলিসি তৈরি করার একটা বিষয় আছে। এটি যেমন সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে তেমনি সংবাদপত্রের মালিক, পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতাসহ সবাইকে নিয়ে তারা যেন নাগরিক জায়গা থেকে এজেন্ডাগুলো সরকারকে দিতে পারে। এই অভিযানটাও আমার মনে হয় শুরু করা জরুরি। তা না হলে কোনো একটা কমিশন করে ভালো পেপার করে হয়তো নীতিমালা তৈরি হবে কিন্তু সেটার বাস্তবায়ন হবে না। অর্থাৎ একদিকে সরকারকে চাপ দেয়া এবং আরেকদিকে কি কি এজেন্ডাগুলো এই নীতিমালায় আনা দরকার সেটা এ ধরনের আলোচনা করে বের করে আনতে হবে। এজেন্ডাগুলো যেন আমরা সুস্পষ্টভাবে চাপ সৃষ্টি করার জন্য সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ।

মঞ্জু : ধন্যবাদ খোন্দকার সাখাওয়াতকে চমৎকারভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য।

এবার আমি আলোচনায় আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের খুব কাছের মানুষ এবং আমাদের শিক্ষক খোন্দকার আলী আশরাফকে। যিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত এবং এখনো সাংবাদিকতা করছেন। সংবাদপত্রে কাজ করতে করতে তিনি যে অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করেছেন, যেগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন, সেখান থেকে কিছু নমুনা এবং দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরে এই আলোচনাকে আরো সমৃদ্ধ করবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

খোন্দকার আলী আশরাফ : ধন্যবাদ সবাইকে। আমি যদিও সংবাদপত্রে বহু বছর ধরেই আছি কিন্তু এই বিজ্ঞাপনের বিষয়টা সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং আমি এটা নিয়ে মাথাও ঘামাতাম না। গোলাম মোর্তোজা যে প্রবন্ধে লিখেছেন সেটা সম্পর্কে আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। সেটা হলো, বিজ্ঞাপন নিয়ে অনেক নোংরামি হয়। কিন্তু এই নোংরামি যে এতোটা অসম্ভব পর্যায়ে চলে গেছে সেই ধারণা আমার ছিল না। এটা পড়ে তো আমার মাথা ঘুরে গেছে। বিজ্ঞাপন নিয়ে যে এ রকম একটা ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে এবং এদের যে একটা সিন্ডিকেট আছে সেই বিষয়টা আমি জানতাম না। আমি মনে করতাম, এটা নিয়ে হয়তো কিছু নয়-ছয় হয়। কিন্তু এটা যে চরম দুর্নীতিতে গিয়ে পৌঁছেছে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল। যাই হোক আমি যেটা বলতে চাই, এটা অসম্ভব কিছু নয়। যেহেতু আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থাতেই পচন ধরেছে সেহেতু সংবাপত্রের ক্ষেত্রে বা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যে পচন ধরবে না, এটাও কিন্তু আমি আশা করি না। তবে হ্যাঁ, একটু বেশি ধরেছে। আমরা সব সময় বলি পুলিশরা দুর্নীতিবাজ, ইনকামট্যাক্সের লোকেরা দুর্নীতিবাজ, আমরা বলি কাস্টমসের লোকেরা দুর্নীতিবাজ। এগুলো প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু এর আড়ালে ডিএফপি যে এতোবড় একটা দুর্নীতির আখড়া, এটা কিন্তু কেউ জানে না। আমি নিজেও খুব ভালো করে জানি না। এটার ফলে একটা বড় রকম অপচয় হচ্ছে। মাহফুজ আনাম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, আমিও সেটা বলতে চেয়েছিলাম। বিষয়টা হচ্ছে, উন্নয়নের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের একটা সম্পর্ক আছে। যা হোক, তিনি বিষয়টা নিয়ে খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছেন বিধায় আমি আর নতুন করে কিছু বলতে চাই না। আমার যে বক্তব্যটা আছে সেটা হলো, এখন আমার ইচ্ছে করছে সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী হওয়া এবং আমার কাজ হবে চাকরি-বাকরি ছেড়ে ওই ডিএফপি'র হোতার কাছে পড়ে থাকা। বুলবুল বলছে আমার নাকি সময় শেষ, তো আমি বুলবুলকে বলবো, ওই যেন এই কাজে নেমে পড়ে।

সালাউদ্দিন আহমেদকে আমরা চিনতাম একজন এমপি হিসেবে। কিন্তু তারও যে একটি সংবাদপত্র পরিষদ আছে সেটা জানতাম না। বাংলাদেশে তো দুটি সংবাদপত্র পরিষদ আছে বলে আমি জানতাম। একটা হচ্ছে নোয়াব এবং আরেকটি হচ্ছে ডিএসপি। কিন্তু সেখানে তো এর নাম কখনো শোনা যায়নি। তিনি এই সংগঠনটা কবে করলেন, কিভাবে করলেন সেটাও তো আমরা জানি না। যা হোক, এসব বলে তো আর কিছু হবে না। এখন ডিএসপিতে যারা আছেন, নোয়াবে যারা আছেন এবং অন্যান্য সংবাদপত্রসেবী যারা আছেন তাদেরকে এসব বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এর জন্য ডিএফপিকে যেভাবেই হোক তার হাত থেকে বিজ্ঞাপন দেয়ার অধিকার বের করে আনতে হবে। কেননা, আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা বেরুতেই থাকবে, যদি ডিএফপির হাতে বিজ্ঞাপন দেয়ার ক্ষমতা থাকে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে ৮ মার্চে নাকি তাদের রিটটা খারিজ হয়ে গেছে। তাহলে কেন এখন পর্যন্ত এটার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি।

বিকেন্দ্রীকরণ করলে হয়তো পুরোপুরি সফল হওয়া যাবে না। তবে দেশের মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় যে ব্যাপক পরিমাণ দুর্নীতি হচ্ছে এটা হয়তো কিছুটা কম হবে। আমি আর নতুন করে কিছু বলতে চাই না। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ এবং আমাকে সুযোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।

মঞ্জু : ধন্যবাদ জনাব খোন্দকার আলী

'পুলিশরা দুর্নীতিবাজ, ইনকামট্যাক্সের লোকেরা দুর্নীতিবাজ, কাস্টমসের লোকেরা দুর্নীতিবাজ। এগুলো প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু এর আড়ালে ডিএফপি যে এতোবড় একটা দুর্নীতির আখড়া, এটা কিন্তু কেউ জানে না'

খোন্দকার আলী আশরাফ
সহকারী সম্পাদক, যুগান্তর

আশরাফকে তার বক্তব্যের জন্য। তিনি বিজ্ঞাপনের নোংরামি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

এবার আমি আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো জনাব শামীম রেজাকে। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষকতা করছেন এবং বিজ্ঞাপন নিয়ে ছাত্রদের পড়ান। সুতরাং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার একটি প্রবণতা রয়েছে। তাকে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

শামীম রেজা : ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই। ভালোই বলেছেন, বিজ্ঞাপনের বিষয়টা আমরা ছাত্রদেরকে পড়াই। ছাত্রজীবনে যখন আমরা বিজ্ঞাপন বন্টনমালার কপি খুঁজতে যেতাম, তখন ডিএফপি থেকে কোনোদিন একটি কপি পাইনি এবং পেলেও সেটা খুব কঠিন কাজ ছিল। গতকাল যখন মঞ্জু ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করছি তখন তিনি বললেন, কপি তো পাওয়া যায়নি, তো বাজার থেকে কিনে আনতে হবে। পরে বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়েছে। সম্ভবত এটা ছিল '৮৭ সালের তৃতীয় সংশোধনী বিজ্ঞাপন নীতিমালা, আমরা যেটা ব্যবহার করছি। প্রথমটা করা হয়েছিল '৭৬ সালে, এরপর '৮২ সালে আরেকবার করা হয়। তারপর '৮৭ সালে এবং এরপর আরো কিছু যোগ করা হয়। এই যে ব্যাপারগুলো বললাম এটা আপনি চাইলে এক জায়গায় বিষয়গুলো পাবেন না। আমার মনে হয়, কিছুটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেরও প্রয়োজন আছে আলোচনার জন্য। যার সঙ্গে আজকের আলোচনাও অনেকটা প্রাসঙ্গিক। '৭৬ সালে যখন বিজ্ঞাপন বন্টন নীতিমালা করা হলো তখন এটি দেখানো হলো যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এর আগে রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে গেছে। সুতরাং বেসরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার সুযোগ '৭৬ সালে শেষ হয়ে গেল। বেশির ভাগ পত্রিকা তাদের বিকাশ, টিকে থাকা, তার জন্ম ইত্যাদি কারণে তাদেরকে সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করতে হলো। '৮২ সালেও যদি আমরা চিন্তা করি সেখানেও কিন্তু পরিস্থিতি আজকের মতো ছিল না। আজকে যেমন বিপুল পরিমাণ বেসরকারি বিজ্ঞাপন, বাইরের বিজ্ঞাপন, করপোরেট কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন পত্রিকাগুলো পেয়ে থাকে। কিন্তু '৭৬ সালে কিংবা '৮২ সালে এবং তৎকালীন সময়ে এরকম ছিল না। পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে। সেটা হলো এখনো পর্যন্ত প্রধান যে ১০/১২টি পত্রিকা আছে তাদের সঠিক প্রচার সংখ্যা আমরা জানি না। প্রবন্ধে সিন্ডিকেটের যে ব্যাপারটা এসেছে সেটা অবশ্যই ভয়ঙ্কর একটা বিষয়। কিন্তু এর পাশাপাশি বিজ্ঞাপন নীতিমালা সংস্কারের ক্ষেত্রে এটাও ভাববার বিষয়। প্রধান যে ১০/১২টি পত্রিকা রয়েছে যারা সরকারি বিজ্ঞাপনের বাইরেও প্রচুর বেসরকারি বিজ্ঞাপন পায়। কিন্তু তাদের প্রচার সংখ্যা নিয়েও নানা মত প্রচলিত। আমরা যদি গত বছর এই গণমাধ্যম সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দেখি (এই মুহূর্তে অবশ্য আমি রিপোর্টটির নাম উল্লেখ করছি না) সেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে, এই যে সংখ্যাটি আমরা দিচ্ছি ১০/১২টি পত্রিকার সেটাও সঠিক কি না আমাদের সন্দেহ আছে এবং সেখানে আবার কোট করা হচ্ছে অন্য আরেকটা পত্রিকাকে যে, অমুক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই ১০/১২ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা এমন। এখন যেই মুহূর্তে আপনি ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন বন্টন নীতিমালা সংশোধন করতে যাবেন সে ক্ষেত্রে শুধু বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর যেকোনো দেশেই পত্রিকাগুলোর প্রচার সংখ্যা একটি বড় বিষয়। যেহেতু আমরা প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রচার সংখ্যা জানি না, সেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার প্রচার সংখ্যা জানার তো প্রশ্নই আসে না। এর মাঝে মফস্বলের পত্রিকাগুলো সমস্যায় পড়েছে। একদিকে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা একটি বড় অংশের বিজ্ঞাপন নিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে বড় পত্রিকাগুলো যেভাবেই হোক বড় অংশের বিজ্ঞাপন নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মফস্বল পত্রিকাগুলো তাদের ব্যাপারে আমরা কিন্তু কম কথা বলছি। আজকে অন্যান্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির সুযোগ প্রধান পত্রিকা এবং ঢাকার পত্রিকাগুলোর তৈরি হয়েছে। সেই সুযোগ মফস্বল পত্রিকার নেই। এদের বিকাশের জন্য সত্যিকার অর্থেই সরকারি বিজ্ঞাপন প্রয়োজন। বিশ্বায়নের বিষয়টা যত বিস্তৃত হবে তত বেশি আমরা বিজ্ঞাপন পাবো। ভবিষ্যতে আমরা আরো বেশি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন পাবো। এটা অসম্ভব কিছু না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রেস বা পত্রিকার ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের ব্যাপারটা অনুমোদিত হয়েছে। বিশেষ করে এই সরকার আসার পর ভারতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। যদি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে বিদেশী বিনিয়োগ থাকতে পারে তবে কেন সংবাদপত্রে সেটা থাকবে না। এটা আশা করা যায়। বাংলাদেশেও সেটা আসবে। সেক্ষেত্রে আরো বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন আসবে এবং প্রধান পত্রিকাগুলোর অনেক বেশি বিজ্ঞাপন পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু তাদের প্রচার সংখ্যা যদি চিরকাল এ রকম গোপন থাকে এবং এই যে অডিট রিপোর্ট সেটাতে তারা কতটুকু সরকারি খাত থেকে পাচ্ছে ও কতটুকু অন্যান্য বাণিজ্যিক খাত থেকে পাচ্ছে সেই স্বচ্ছতা নেই। আমার মনে হয়, দ্বিতীয় কণ্ঠ নীতিমালায় এ রকম একটা উল্লেখও ছিল যে, অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন একটি রিপোর্ট দেবে এবং সেই অডিট রিপোর্টে বলা হবে কি পরিমাণ বিজ্ঞাপন ডিএফপি থেকে পত্রিকাগুলোতে গেছে, কি পরিমাণ বিজ্ঞাপন অন্যান্য খাত থেকে তারা সংগ্রহ করেছে। যদি আপনি এই জিনিসটা পেতেন তাহলে একটি সমতা বিধানের সুযোগ তৈরি হতো। যেমন কোনো পত্রিকার বাণিজ্যিক খাত থেকে বিজ্ঞাপন পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করে সরকারি বিজ্ঞাপন দেয়া হলে বাণিজ্যিক খাত থেকে যদি বেশি বিজ্ঞাপন আসে, তাহলে সরকারি খাতের বিজ্ঞাপন কমে আসবে। একই সঙ্গে বলা হচ্ছে, পত্রিকাগুলো নিজে একটি রিপোর্ট দাখিল করবে। এটি হচ্ছে আমার অন্যান্য খাত থেকে বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির পরিমাণ এবং সরকারি খাত থেকে প্রাপ্তির পরিমাণ কত? এটা কিন্তু ঘটে না। অতএব স্বচ্ছতা যদি আমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে আমরা অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে তো রাতারাতি স্বচ্ছ বলতে পারবো না। আবার যদি ফিরে আসি মফস্বল পত্রিকার ক্ষেত্রে এদের বিকাশের কি হবে? যতই বিশ্বায়ন হোক, এরা নিশ্চয়ই রাতারাতি এই আন্তর্জাতিক বিনিয়োগগুলো পাবে না কিংবা বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন পাবে না। এজন্য মফস্বল সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন

'আমাদের যে বস্তুনিষ্ঠতার সংকট তা কেটে যাবে যদি সাংবাদিকরা বেশি বেশি মূর্খ হয়। তারা কিছু জানে না, কিছু বোঝে না শুধু বসে বসে শোনে এবং লেখে। এতে বস্তুনিষ্ঠতার আর কোনো সমস্যা থাকবে না'

মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল
নির্বাহী সম্পাদক, সংবাদ

বন্টনের নীতিমালা আলাদা হওয়া উচিত কি না সে বিষয়টা মনে হয় ভেবে দেখা যেতে পারে।

মঞ্জু : ধন্যবাদ শামীম রেজা। এখন বক্তব্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি আসিফ নজরুলকে।

আসিফ নজরুল : প্রতিটি দেশেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের একটা নীতিমালা থাকে। এখন এই নীতিমালার ক্ষেত্রে সমস্যাটা কোথায়? একটা জিনিস বলে দেয়া হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠতা। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠতা মাপবো কিভাবে? নীতিমালায় আমি যে চারটা শর্ত দেখলাম এর মধ্যে দুটি জিনিস মাপা যায়, একটা হচ্ছে প্রচারসংখ্যা এবং আরেকটা ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন হয়েছে কি না। এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ মাপা যায়। প্রচার সংখ্যার বিষয়ে আমরা সরকারকে দোষ দিতে পারি কিংবা দুর্নীতি করছে এটা বলতে পারি। কিন্তু এগুলো খুবই পুরনো কথা। এই অবস্থায় আমার মনে হয় আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে আমাদের বলতে আমি প্রেসকে বোঝাচ্ছি। আজকে যদি আমরা প্রেসের দিকে তাকাই তাহলে প্রচারসংখ্যা কার কত?

আমরা জানি, একটি দৈনিক ওপরে লিখে থাকে প্রচার সংখ্যার সর্বশীর্ষে। বিভিন্ন দৈনিকের মধ্যেই এক ধরনের বিভেদ ও বিভ্রান্তি রয়েছে। আমরা কখনোই স্বীকার করি না ঐ পত্রিকার সার্কুলেশন এ রকম। আমি যখন বিদেশে ছিলাম তখন দেখলাম, ওরা সার্কুলেশন নাম্বার উল্লেখ করে দেয়। আমি গতকাল ভারতের আইন দেখছিলাম, সেখানে অফিস অব রেজিস্টার অব নিউজপেপার ফর ইন্ডিয়া আছে। এই অফিসের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে যদি প্রচারসংখ্যা নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি দেখা দেয় তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে তারা যাচাই করে একটি পাবলিক রিপোর্ট দেয় যে, এই পত্রিকার এই প্রচার সংখ্যা। আমি সচেতনভাবেই একটা প্রশ্ন তুলতে চাই, কখনো প্রচার সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য যাচাই করার সৎ সাহস কি আমাদের পত্রিকার মালিকদের আছে? দ্বিতীয় পরিমাপযোগ্য বিষয় হচ্ছে ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন। ওয়েজ বোর্ড কি আমাদের পত্রিকাগুলো বাস্তবায়ন করেছে? কয়টা পত্রিকা করেছে? আপনারা সবাই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং ভালো করেই জানেন আপনারা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেন।

বাকি যে দুটি অপরিমাপযোগ্য জিনিস রয়েছে সেটা হলো বস্তুনিষ্ঠতা এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমর্থন করা। বস্তুনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটা জিনিস আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, সেটা হলো এখানকার ধারণা হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে না লিখলে পত্রিকা চলে না। আমাদের এখানে বস্তুনিষ্ঠতার সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কে কত সরকারের বিরুদ্ধে লিখতে পারে। তবে বাংলাদেশের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা হবেই। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, আমার অ্যাপ্রোচটা কি হবে? আমরা যখন দেখি ১১ সেপ্টেম্বরের পরে বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রের গ্যাস, ট্রানজিট সুবিধা, কোর্ট স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানের কারণে আমাদের যেখানে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের স্বীকার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকা মানবাধিকার রিপোর্ট প্রকাশ করে সেটা আমাদের পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে যাবে। ভারতের পত্রিকা কিন্তু এটা এতটা গুরুত্ব দিয়ে যাবে না। কারণ এটা অন্য দেশের একটি মতামত। যে দেশের মানবাধিকার রিপোর্ট নিয়েও আমাদের প্রশ্ন আছে, এই রিপোর্টগুলোর উৎস হচ্ছে সংবাদপত্র। ধরা যাক, আমি দৈনিক বাংলার সাংবাদিক। এখন দৈনিক বাংলা রিপোর্ট করলো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ঐ সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটা দলিল রচনা করা হলো, বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এরপর একই জিনিস আমি যখন পুনরায় ছাপি তখন সেটা ৪/৫ কলামে ছাপাই। আমার আপত্তি হচ্ছে, যখন আমি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী দলের প্রক্রিয়াতে জেনে বা না জেনে এদের সঙ্গে জড়িত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের দেশের পত্রিকাগুলো পৃথক পৃথকভাবে যে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট করে, সেটা সে অবশ্যই করবে। তারা করে বলেই আজ আমি, আপনি র‍্যাবের হাতে পড়িনি এবং অনেক বঞ্চিত মানুষ মানবাধিকার পায়। কিন্তু পত্রিকার কণ্ঠ যখন বিদেশী কণ্ঠের সঙ্গে মিলে যায় তখন বস্তুনিষ্ঠতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আমি এমনও দেখেছি, সাংবাদিকরা হ্যারি কে টমাসকে ডেকে এনে সভা করছে। হ্যারি কে টমাস কে? এই যে বস্তুনিষ্ঠতার প্রশ্নে তখন যদি প্রশ্ন ওঠে আসলে মিডিয়ার ভূমিকাটা কি? এটা যদি মানুষের মনে আসে তখন সেটা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন হবে। আসলে আমি যেটা বলছি, সাংবাদিকদের দায়িত্বশীলতার প্রশ্নটি। গোলাম মোর্তোজা যে প্রবন্ধটি তুলে ধরেছেন সরকারের দুর্নীতি, সিন্ডিকেট, আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা; এগুলো এতোই সত্য যে, এসব বিষয়ের সঙ্গে একমত না হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এগুলো নিয়ে আমি আর পুনরুক্তি করতে চাই না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি প্রেসকেও কিছু জিনিস বুঝতে হবে। আমরা যখন সাংবাদিক ছিলাম তখন একটা সাংবাদিক ইউনিয়ন ছিল।

আমাদের শিক্ষক সমিতি কিন্তু ভাগ হয়নি, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মধ্যে বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে কিন্তু তারাও ভাগ হয়নি; সাংবাদিক সমিতি ভাগ হয়েছে। তাদের দুটি সমিতি বর্তমানে। বিএনপি সরকার যাই করুক না কেন সমিতির একটা অংশ সরকারের পক্ষে যাবে আবার সমিতির আরেকটা অংশ সব সময় আওয়ামী লীগের পক্ষে থাকবে। এ অবস্থায় সাংবাদিক সমিতি যদি তাদের স্বার্থে বিভক্ত শক্তি নিয়ে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে তাহলে সেটা খুবই দুর্বল হবে। অবশ্য আজকে মোর্তোজা কিছু প্রস্তাব দিয়েছে এবং শামীমও চমৎকার কিছু বিষয় তুলে এনেছেন। আমি নিজেও মনে করি, ডিএফপি রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সাংবাদিকরা তাদের সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কিছু বিষয় তারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখতে পারেন। একটা হচ্ছে প্রচারসংখ্যার স্বচ্ছতা। এটার জন্য দরকার হলে সিভিল সমাজ ও সংবাদপত্রের সঙ্গে যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে একটি ইউনিট করতে হবে। যারা স্পষ্টভাবে যাচাই করবে সবকিছু। আরেকটা হচ্ছে ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন করা। এই দুটি জিনিস করলে তখন আপনি বাকি বিষয়টা নিয়ে বলতে পারবেন এবং এই বলাটা যেন সম্মিলিত কণ্ঠে হয়। ধন্যবাদ সবাইকে।

মঞ্জু : ধন্যবাদ জনাব আসিফ নজরুলকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার জন্য। বিশেষ করে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা নিয়ে যে

‘দুর্নীতিটা এখন আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেছে। এটা এখন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কিংবা অন্য যে কেউ বলুক, সেটা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই’

ফরিদ হোসেন

ব্যুরো চিফ, এপি

বিতর্ক রয়েছে সে বিষয়ে স্বচ্ছতার বিষয়টিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তিনি উপস্থাপন করেছেন। এর বাইরেও প্রেসের আত্মসমালোচনার জায়গাটিতেও তিনি বারবার জোর দিয়েছেন।

এবার আমি বক্তব্য উস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি এপির ব্যুরো চিফ ফরিদ হোসেনকে।

ফরিদ হোসেন : আসলে আমি কিছু বলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। মূলত শোনার জন্যই এসেছিলাম। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই গোলাম মোর্তোজাকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। এর মধ্যে অনেক কষ্ট, অনেক গবেষণা জড়িত আছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও আমি বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জড়িত না। আমি একজন সাংবাদিক এবং সারা জীবন বার্তা সংস্থাতে কাজ করছি বলে দেশী ও বিদেশী বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ নেই। আমি পত্রিকার কাজও করিনি। রিপোর্টারের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বিষয়টা জড়িত না। কেননা, আমি মালিক কিংবা প্রকাশক কোনোটাই না। এখানে এসে অনেক কিছু জানলাম।

আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার অনেক ব্যবসায়ী বন্ধু প্রায়শই আমাকে এসে বলে, ভাই আপনি ও রকম একটা পত্রিকার ওমুককে চেনেন কি না? তখন আমি তাদের বলেছি, এ রকম কোনো পত্রিকার নাম তো শুনিনি তবে দেখি খোঁজ-খবর নিয়ে। মাঝে মাঝে দু'-একটি মিলেও যায়। আমরা সবাই জানি আমাদের এখানে নীতিমালা উদার হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকগুলো পত্রিকা আছে। মূলত এই পত্রিকাগুলোর নাম অনেকে জানি না এবং এগুলো ব্ল্যাক মেইলিংয়ের মাধ্যমে চলে। মূলধারার কিছু পত্রিকা বাদ দিলে সবই এ ধরনের পত্রিকা। এটা আমি জানতাম। কিন্তু এর পরিমাণ যে এতো সেটা গোলাম মোর্তোজার প্রবন্ধ পড়ে জানলাম। এখানে আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, বিজ্ঞাপন, সরকারি বিজ্ঞাপন পুরো ব্যাপারটা যদি আমাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, তাহলে কিন্তু ঠিক হবে না। একটা হচ্ছে যে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিটা আসছে ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে। এখন ক্ষমতার অপব্যবহারটা কেন আসছে? কারণ একটা নির্দিষ্ট সংস্থা আছে ডিএফপি নামে। যার কাছে বিজ্ঞাপন জিনিসটা দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে ডিএফপিতে যেটা করা হচ্ছে সেটা হলো বছরের পর বছর দুর্নীতি চলছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং আরো সুস্পষ্ট করে বললে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বা সরকারি লোকের পৃষ্ঠপোষকতা এখানে আসছে। কাজেই এভাবে সমাজের যেখানেই দুর্নীতিটা হচ্ছে তার প্যাটার্ন কিন্তু একই। দুর্নীতিটা এখন আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেছে। এটা এখন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কিংবা অন্য যে কেউ বলুক, সেটা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। এই পত্রিকাগুলো এমনভাবে দুর্নীতি করছে যে, তাদের বিচার চেয়ে কোনো লাভ নেই। কেননা এসব পত্রিকা ডিএফপি থেকে কাগজে-কলমে তাদের সার্কুলেশন ৬ হাজার কিংবা তারও বেশি করে নিয়ে বিজ্ঞাপন পাচ্ছে। এই সিন্ডিকেট ঠিক মাফিয়াদের মতো এমনভাবে দুর্নীতিটা করছে যে, সবাই জানলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। তাহলে ডিএফপির মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই? এই প্রশ্নের এক কথায় কোনো সমাধান আমি দেখতে পাচ্ছি না। এটা বিলুপ্ত করে দিলেও এর কোনো সমাধান হবে না। এটা বিলুপ্ত করে দিলে তথ্য মন্ত্রণালয় বা পানি উন্নয়ন বোর্ড কিংবা পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সরাসরি বিজ্ঞাপন দেবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এরাও দুর্নীতিগ্রস্ত থাকতে পারে। আজকে দেখেন স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন করা হলো। কিন্তু আমরা সেখানে কি দেখতে পাচ্ছি? চিত্রটা সব জায়গাতেই এক রকম। আজকের সভাপতি আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যারের লেখাতেই পড়েছি আমরা আশাবাদী হতে চাই এবং সেটা আমিও চাই। কিন্তু ডিএফপি ভেঙে যদি আরেকটি প্রতিষ্ঠান করা হয় তবে সেখানেও একই রকম ঘটনা ঘটবে। তবে হ্যাঁ, একটা সমাধান আছে সেটা হলো রাজনৈতিক যে নেতৃত্ব এবং সমস্যা যেখানে সেখানে যদি আমরা ঠিক করতে পারি তাহলেই একমাত্র সমস্যার সমাধান হতে পারে। আজকে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আছে বলে বিএনপির কেউ এই সিন্ডিকেটের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু কালকে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তাহলে তাদের কোনো একজন এটার নেতৃত্ব দেবে। সুতরাং ডিএফপি বন্ধ করে কিংবা এর সংস্কার করে সরাসরি ফল পাওয়া যাবে না। অতএব এই সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমত আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জায়গাতে সংস্কার করতে হবে এবং এটা এর একমাত্র সমাধান হতে পারে।

মঞ্জু : ধন্যবাদ ফরিদ হোসেনকে বিষয়টিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার জন্য এবং তার সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কের বিষয়টি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

আমরা সূচনাপর্বে যে কথাটা বলেছিলাম যে, মফস্বল এলাকায় কাজ করতে গিয়ে আমরা বিজ্ঞাপনপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় পত্রিকাগুলোর যে সংকট, সে জায়গা থেকেই কিন্তু এখানে আজকের এই আলোচনাকে নিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের মাঝে স্থানীয় পর্যায়ের একজন সম্পাদক রুদ্র মাসুদ উপস্থিত আছেন।

তিনি নোয়াখালী থেকে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এখন তাকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

> 'আমাদের শিক্ষক সমিতি কিন্তু ভাগ হয়নি, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মধ্যে বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে কিন্তু তারাও ভাগ হয়নি; সাংবাদিক সমিতি ভাগ হয়েছে। তাদের দুটি সমিতি বর্তমানে'
>
> **ড. আসিফ নজরুল**, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রুদ্র মাসুদ : শুভেচ্ছা সবাইকে। আজকের সরকারি বিজ্ঞাপন নীতিমালা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এর নীতি সংলাপে আমি নোয়াখালী থেকে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করি বলে তার সূত্র ধরেই এখানে অংশগ্রহণ করা। মঞ্জু ভাই বক্তৃতার শুরুতে বলেছিলেন সুশাসন ও গণতন্ত্রের বিষয়ে মফস্বল পত্রিকাগুলো বেশি বেশি করে লিখছে এবং তুলে ধরছে মানুষের জীবনযাত্রা। সব মিলিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্র বিকাশের মধ্য দিয়ে সেটা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পত্রিকাগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র ও সুশাসন কতটুকু আছে? আমি ব্যক্তিগতভাবে যুগান্তরের বেগমগঞ্জ প্রতিনিধি। কিন্তু আমি দেখেছি মফস্বল পাতায় আমার এলাকার খবর খুবই গুরুত্বহীনভাবে ছাপা হয়। সে জন্য আমার মনে হয়েছে প্রান্তিক মানুষের অধিকার তুলে ধরার জন্য একটি পত্রিকা সম্পাদনা করা দরকার এবং এরই সূত্র ধরে আমার পত্রিকা বের করা। অনেক উৎসাহ নিয়ে যখন পত্রিকা প্রকাশ করতে চাইলাম তখন

দেখলাম নানা দিক থেকে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নোয়াখালীতে স্থানীয় পত্রিকা আছে ৩৩টি কিন্তু ডিএফপির তালিকাভুক্ত পত্রিকা আছে দুটি। আমার পত্রিকার যে পরিমাণ সার্কুলেশন আছে সে পরিমাণ সার্কুলেশন সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর নেই। ঢাকার সালাউদ্দিন এমপির যে পত্রিকা আছে তার চেয়ে আমার পত্রিকার সার্কুলেশন অনেক বেশি। কিন্তু আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তবে আমার সহযোদ্ধারা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ডিএফপির মিডিয়াভুক্ত হওয়ার জন্য কিন্তু আমি সেই পথে যাইনি। কারণ ডিএফপির মিডিয়াভুক্ত তালিকায় যেতে হলে কমপক্ষে ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকা ডিএফপি'র বিভিন্ন জায়গায় দিতে হয়। তারপর আবার বছর বছর অডিট করবে এবং সেখানেও তাদের টাকা দিতে হবে। এছাড়া বিজ্ঞাপনের জন্য ডিএফপিতে লোক থাকতে হবে। বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আমরা শুধু ডিএফপির দ্বারা বঞ্চিত হচ্ছি না আমার বঞ্চিত হচ্ছি ঢাকার পত্রিকারগুলোর স্থানীয় প্রতিনিধি দ্বারাও। কেননা ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলো তাদের স্থানীয় প্রতিনিধি, বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিলে সেখান থেকে তাদের কমিশন দেয়া হয়। এ জন্য আমরা বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছি। একদিকে আমরা সরকারে বিজ্ঞাপন নীতিমালার কারণে বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, অন্যদিকে মূল ধারার পত্রিকাগুলোর স্থানীয় সংবাদিকদের বেতন না দিয়ে তাদেরকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের মাধ্যমে কমিশন দেয়ার যে প্রচলিত ধারা আছে সেটার মাধ্যমে। প্রস্তাব এসেছে ডিএফপিকে বিলুপ্ত করা যায় কি না কিংবা বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় কি না? সে ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হলো জেলা কিংবা থানা পর্যায় থেকে যে সমস্ত পত্রিকা বের হয় তাদের জন্য সরকারের আলাদা করে নির্দিষ্ট একটি নীতিমালা থাকা দরকার এবং বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রেও সেটা হতে পারে। দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে মিডিয়া তালিকাভুক্ত কোনো পত্রিকাই যেন স্থানীয় পর্যায় থেকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ না করে। কারণ নোয়াখালীতে যে দুটি মিডিয়াভুক্ত পত্রিকা আছে সেটা মাসে সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ দিন বেরোয় আর ঢাকার আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার মতো একদিনে ৩০ কপি ছাপায়।

মঞ্জু : ধন্যবাদ রুদ্র মাসুদকে। স্থানীয় পর্যায় থেকে সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো হয় এবং একটি পত্রিকা চালানোর ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো হয় সেটা i"` মাসুদের কাছ থেকে জানতে পারলাম। এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার জন্য কি করা যেতে পারে সে ব্যাপারে তার নিজস্ব কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন। এবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব এরশাদ মজুমদারকে। যিনি দ্য ডেইলি ফসলের চিফ এডিটর।

> 'শুধু বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর যেকোনো দেশেই পত্রিকাগুলোর প্রচার সংখ্যা একটি বড় বিষয়। যেহেতু আমরা প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রচার সংখ্যা জানি না, সেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার প্রচার সংখ্যা জানার তো প্রশ্নই আসে না।
>
> **শামীম রেজা**, প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এরশাদ মজুমদার : আমি রুদ্র মাসুদের অনেক কথাই সমর্থন করি। আমি মফস্বলে সাংবাদিকতা করেছি ৫ বছর, ঢাকায় ৩ বছর করার পর আবার মফস্বলে গেছি এবং তারপর আবার ঢাকায় এসেছি আর ফিরে যাইনি গ্রামে। আমার প্রথম পত্রিকা এই ফসল পত্রিকা। এটি কৃষি পত্রিকা। আমার দৃষ্টিতে গোলাম মোর্তোজা যেটি তৈরি করেছেন সেটি সামান্য রাজনৈতিক দোষে দুষ্ট। এখানে আমি হলে এভাবে তৈরি করতাম না। রাজনীতিটা স্পষ্টভাবে দেখা যেতো না। আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার সৃষ্টির রহস্য হচ্ছে সরকার নিজেই। কারণ সরকার যদি কাউকে টাকা দিতে চায় তার প্রক্রিয়া হচ্ছে, তুমি এ রকম একটা পত্রিকার অনুমোদন নাও তাহলে আমি তোমাকে বছরে তিন লাখ টাকা দিয়ে দিতে পারবো। যেমন আজকের প্রত্যাশার মালিক বিএনপি সমর্থিত একজন, একমাসে ২৯২৬´ বিজ্ঞাপন পেয়েছেন। আমার ভাগ্য ভালো এখানে আমার পত্রিকার নাম নেই। দৈনিক সমাচারের যিনি আছেন তিনি তো এ ব্যাপারে ওস্তাদ লোক বলা যায়। মঞ্জুকে ধন্যবাদ ওস্তাদের নাম এসেছে। যাই হোক, আমার একটা প্রস্তাব আছে এই মিটিংয়ে। পাকিস্তান আমলে স্পেশালাইজড নিউজ পেপার বলে একটি ধারণা ছিল। যেমন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যে সাহিত্য পত্রিকাটি বের করেন সেটার সার্কুলেশন এক কিংবা দুই লাখ হবে, এটা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু তিনি যে পত্রিকাটি বের করে সেটা একটি মূল্যবান কাগজ। সুতরাং এটাকে স্পেশালাইজড ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। cwK¯vb Avg‡j GUv Kiv n‡Zv কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর এই ব্যাপারটা উঠে গেছে। আর এ দেশে এতো দৈনিক বের হবার মূল কারণ হচ্ছে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সরকার বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং এ সভা থেকে ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টারের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রস্তাব যাবে যে, সাহিত্য, কম্পিউটার বা ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ক পত্রিকাকে আলাদা করে বিজ্ঞাপন দেয়ার একটা আলাদা বাজেট থাকবে। কারণ মাসুদ সাহেব যেখানে পত্রিকা বের করেন সেখানে ইত্তেফাক বড় পত্রিকা হলেও তার চেয়ে বেশি চলবে মাসুদ সাহেরে পত্রিকা। তাহলে সেখানে মাসুদ সাহেবের পত্রিকাটিই বড়, ইত্তেফাক নয়। বাংলাদেশে উন্নয়নের খবর সবচেয়ে বেশি ছাপে গ্রামগঞ্জের ছোট ছোট পত্রিকাগুলো। কিন্তু সেসব পত্রিকার গুরুত্ব দেয়া হয় না। এই যে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার কথা বলা হচ্ছে, এসব পত্রিকা কোথায়? এর ৯০% পত্রিকা ঢাকার। তার মধ্যে আমারও দুটো আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা আছে। আন্ডারগ্রাউন্ড হওয়ার কারণ আমি এক সময় ওয়েব অফসেট মেশিন বসিয়েছি। তারপর কাগজ বের করেছি। এক সময় আমি নামকরা কাগজের প্রকাশক ছিলাম এবং আমাকে বলা হতো 'নিউজ পেপার এক্সপার্ট' কিন্তু সরকারের নীতির পরিবর্তনের পরে আমি এখন আর এক্সপার্ট না। এখন আমি উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছি। কারণ ডিএফপিতে আমি গত ২৫ বছর পরিদর্শন করিনি এবং ডিএফপির লোকেরা এখনো বলে 'ঐ যে এরশাদ মজুমদারের কাগজ, তাকে বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। বিজ্ঞাপনও নেবে আবার কামড়ায়েও দেবে।' ডিএফপি থেকে বিজ্ঞাপন আনতে হলে সেখান থেকে যা পাবেন তার অর্ধেক টাকা বিল নেয়ার সময় দিয়ে আসতে হবে। দৈনিক কাগজ কেন বের হচ্ছে? এটা আগে বের করতে হবে। কোনো মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বের করার জন্য যদি দরখাস্ত দেয়া হয় তাহলে সেটা মাসের পর মাস পরে থাকবে। পত্রিকার অনুমোদনের জন্য প্রথম আসতে হবে তথ্যমন্ত্রীর কাছে। তথ্যমন্ত্রীর আবার মামাতো, খালাতো ইত্যাদি ভাই থাকে। তিনি আগে দেখা করেন। দেখা করে বলেন, আপনি কি আসলে কাগজ চান? যদি চান তাহলে মাসিক পারবো না, আপনি

দৈনিক বের করেন। এরপর ৪/৫ লাখ টাকা দাবি করবে। এমন খবরও আছে যে এই প্রেসক্লাবের হলে এক তথ্যমন্ত্রীর স্ত্রীকে ৯ লাখ টাকা দামের হীরের হার পুরস্কার দিয়েছেন। এ রকম একটি গল্প প্রচলিত আছে এবং যিনি এটি দিয়েছেন তার নাম এই প্রবন্ধে আছে। এই যে প্রবন্ধটি যিনি লিখেছেন গোলাম মোর্তোজা সাহেব সেটা আমি পড়েছি। আমিও এ ধরনের একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটাতে ছিল, সরকারের অডিট রিপোর্টে ৪৫ লাখ কাগজের সার্কুলেশন আছে। এর মধ্যে ১৫ লাখ কাগজের সার্কুলেশন ঢাকায় এবং ৩০ লাখ কাগজের সার্কুলেশন মফস্বলে। এখন বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ১৫ লাখ কাগজ পায় ৯০ শতাংশ এবং বাকি বিজ্ঞাপন পায় মফস্বলের পত্রিকা।

মঞ্জু : ধন্যবাদ এরশাদ মজুমদারকে একটি চমৎকার উপভোগ্য বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগত ক্ষোভের জায়গা থেকে অনেক তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন। এগুলো একেবারে জীবন্ত তথ্য। বিশেষ করে যেই বিষয়ের ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি আমাদের বিবেচনার মধ্যে আনতে পারি। এটি হচ্ছে বিশেষ বিষয়ে বিশেষ ধরনের পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যবস্থা করা।

খোন্দকার আলী আশরাফ : বিশেষায়িত পত্রিকার ধারণা ভালো এবং এটার সঙ্গে আমিও একমত। বিষয়টা হচ্ছে বিশেষ ধরনের পত্রিকার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেয়া উচিত। কিন্তু এটাকে আমি নীতিগতভাবে সমর্থন করলেও বাস্তব দিক থেকে এর সমর্থন করি না। কারণ এটা হলে দেখা যাবে যে, বিশেষায়িত পত্রিকার নামে আরো অনেক আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা বের হবে।

শেখ রকিব উদ্দিন : বিশ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আজকের আলোচনায় বলতে পারি বিজ্ঞাপন হচ্ছে সংবাদপত্রের দ্বিতীয় উপাদান। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রথম উপাদান সংবাদের সঙ্গে এটি সম্পর্কযুক্ত। তাই বিজ্ঞাপন নিয়ে আজকের এই আলোচনা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। আন্ডারগ্রাউন্ড মানে হচ্ছে অবৈধ, তাহলে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা থাকবে কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি বলতে চাই, সাংবাদিক ইউনিয়ন যদি একত্র না হয় তাহলে সমস্যা দূর হবে না, বিজ্ঞাপন বন্টন সুষ্ঠু হবে না। আর তা না হলে সাংবাদিক, সংবাদপত্র কিছুই থাকবে না।

ফরহাদ চৌধুরী : আমি আজকের কাগজের বিজ্ঞাপন জেনারেল ম্যানেজার। আমাকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছিল এখানে আসার জন্য এবং সে কারণেই এখানে আসা। কিন্তু বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অন্যান্য

‘শুধু বিজ্ঞাপন নয়, মিডিয়ার নিয়মনীতির প্রতি সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেটা বোঝা যায়। সরকারি বিজ্ঞাপনের দুর্নীতির ফলে শুধু উন্নয়ন প্রক্রিয়াকেই ব্যাহত করছে না, এটা জ্ঞান প্রক্রিয়াকেও ব্যাহত করছে’

খোন্দকার সাখাওয়াত, গবেষক, পিপিআরসি

পত্রিকার সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তাদের কাউকে দেখছি না। তারা থাকলে আজকের আলোচনা আরো ভালোভাবে করা যেত। কারণ আমরা এই সেক্টরে কাজ করছি এবং সমস্ত ঘটনা আমাদের চোখের সামনে হচ্ছে। আমি বলতে চাই, নীতিমালা যেটা হয়েছে ১৯৮৭ সালের পরে আর কোনো সংস্কার হয়েছে কি না সেটা আমাদের জানা নেই। আমার মনে হয় বিজ্ঞাপন নীতিমালা সংস্কারের চেয়েও আগে বিজ্ঞাপনের মূল্যবৃদ্ধি করার দাবিতে পদক্ষেপ নেয়া দরকার এবং বিজ্ঞাপনের ইঞ্চি বাড়াতে হবে।

মঞ্জু : এখন রবিউল বলতে চাচ্ছে।

রবিউল : সবাইকে অভিনন্দন। আমি মাস্‌লাইন মিডিয়া সেন্টারের গবেষণা বিভাগে কাজ করি। এই গবেষণার সুবাদে ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল। বিজ্ঞাপন বণ্টন উপকূলীয় সংবাদপত্রের ওপর কি রকম প্রভাব ফেলে এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করার। এ কাজ করতে গিয়ে বাস্তব কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আজকে যে বিষয়টি প্রস্তাবিত হয়েছে তা আমাদের ঐ কাজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেখান থেকেই জাতীয় পর্যায়ে এটা নিয়ে কাজ করার কথা ভাবা হয়। আমি কাজের ফলাফল নিয়ে কথা বলতে চাই না। একটা বিষয় বিশেষ করে মোর্তোজা ভাইকে আমি বিনীতভাবে বলতে চাই, তার প্রবন্ধটিতে আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেস এবং কিভাবে বণ্টনে রাজনৈতিক ধারা মিলিয়ে আমরা একটি বাস্তবতাকে দেখতে পাই। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিত একত্রিত করে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগানো যেত তার যদি একটা দিকনির্দেশনা আমরা প্রবন্ধটিতে পেতাম তাহলে আমাদের আরো সুবিধা হতো। বিশেষত আজকের আলোচনাটা আরো তাৎপর্যপূর্ণ হতো। দ্বিতীয়ত, বলতে চাই যে, সুষম বিজ্ঞাপন বণ্টন কেন প্রয়োজন? স্থানীয় পত্রিকা নিয়ে কথা বলেছিলেন শামীম স্যার। স্থানীয় পর্যায়ে যে পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয় তারা নানা রকম আর্থিক দৈন্যতার মধ্য দিয়ে তাদের প্রকাশের কাজটা চালিয়ে যায়। আরো একটি বিষয় আমি অবতারণা করতে চাই। উপকূলীয় এলাকার সংবাদপত্র বিশেষত স্থানীয় সংবাদপত্রের উদ্ভব এবং বিকাশের ধারাটা আমরা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিলাম। আমরা দেখেছি, সমাজের জন্য কিছু একটা করার প্রত্যয় নিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি কিছু ধারা যুক্ত হয়েছে, সেটা আমরা অস্বীকার করি না। আমাদের কাজ থেকে কিছু প্রস্তাব উঠে এসেছিল। যেমন, আমাদের যে নীতিমালা রয়েছে তা স্থানীয় পত্রিকা বান্ধব নয়। স্থানীয় পত্রিকা বান্ধব করতে হলে নীতিমালার পরিবর্তন খুবই জরুরি। আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, যে নীতিমালাটি বর্তমান আছে তা জাতীয় ও স্থানীয় পেশাদার সাংবাদিকদের যৌথ প্রয়াসে আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় কি না এ বিষয়টি সবাইকে বিবেচনার কথা বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি।

মঞ্জু : আমি এখন অনুরোধ করবো মঞ্জরুল আহসান বুলবুলকে আলোচনা করার জন্য। তাকে অবশ্য সবার কাছে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই।

মঞ্জরুল আহসান বুলবুল : শ্রদ্ধেয় সভাপতি ঢাকা ও ঢাকার বাইরের সহকর্মী সাংবাদিক বন্ধুরা এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আসিফ নজরুল অবস্থাটা তুলে ধরেছেন, আসলেই আমরা যারা মিডিয়ায় কাজ করি তারা একটু যুদ্ধাবস্থার মধ্যে আছি। কয়েক দিন ধরে লাগাতারভাবে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, ব্যারিস্টার মন্ত্রী এমনভাবে মিডিয়াকে সামনে তুলে ধরেছেন যে, মনে হচ্ছে আমরা যারা সাংবাদিকতা করি তারা যুদ্ধের মধ্যে আছি। এই পরিস্থিতির মধ্যে একজন ব্যারিস্টার মন্ত্রীর একটা কথা আমি খুব বিশ্বাস করি। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সাংবাদিকরা সব মূর্খ।

আমি নিজেও এটা খুব বিশ্বাস করি। তারপর এরকম অনুষ্ঠানগুলোতে আসি। জ্ঞানী লোকদের কথা শুনি এবং সেটা লেখার চেষ্টা করি। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি মনে করি যারা জ্ঞানী তারা বলেন আর আমরা যারা মূর্খ তারা লিখি। আমি আরো মনে করি, আমাদের যে বস্তুনিষ্ঠতার সংকট তা কেটে যাবে যদি সাংবাদিকরা বেশি বেশি মূর্খ হয়। তারা কিছু জানে না, কিছু বোঝে না শুধু বসে বসে শোনে এবং লেখে। এতে বস্তুনিষ্ঠতার আর কোনো সমস্যা থাকবে না। আসিফ নজরুল অনেকগুলো প্রশ্ন তুলেছেন। সাংবাদিকদের দায়িত্ববোধ, দেশের ভাবমূর্তি এগুলো প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বিষয়। আরো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে আমরা তার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবো। তার কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গে আমি একমত আবার কোনো কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করি। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বক্তব্য আমরা ছাপালাম না, কিন্তু মৌলভীবাজারের এক এমপি লন্ডনের জনমত পত্রিকার সিলেটেরই এক সম্পাদককে সিলেট থেকে তাড়া করে চট্টগ্রাম নিয়ে গেলেন। চট্টগ্রাম থেকে তিনি লন্ডনে গিয়ে প্রেস কনফারেন্স করলেন। সেটা যদি আমরা ছাপি তাহলে কি অবস্তুনিষ্ঠতা হবে? সংসদীয় কমিটি সিএনজি কেনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করার জন্য যে কমিটি করলো তা যদি কাজ করতে না পারে সেই খবর ছাপালে কি অবস্তুনিষ্ঠতা হবে? প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া আইন অমান্য করে রেলের জমি নিজের স্ত্রীর নামে দিয়ে দিলেন, সেই খবর যদি আমরা ছাপি তাহলে কি অবস্তুনিষ্ঠতা হবে? এ ধরনের কাজ করার জন্য সাংবাদিকদের যতটুকু মূর্খতা দরকার ততোটুকু তারা অর্জন করুক এটা আমার প্রত্যাশা। এই বিষয়গুলোর দিকে না গিয়ে আমি আজকের বিষয় বিজ্ঞাপন নীতিমালার ওপর জোর দিতে চাই। শামীম খুব ভালো বলেছে। আমার কাছে দুটো নীতিমালা রয়েছে। একটি ১৯৮৭ সালের এবং আরেকটি ১৯৯৬ সালের। দুটি নীতিমালার ভূমিকা প্রায় একই রকম। আমি একটু পড়ে শোনাই। ৮৭ সালের টায় বলা হয়েছে, 'সংবাদপত্রের সুষ্ঠু বিকাশ, গুণগত মানোন্নয়ন, প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি, বস্তুনিষ্ঠতায় উৎসাহদান এবং সর্বোপরি ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার পূর্বোক্ত সব বিজ্ঞাপন নীতি বাদ দিয়ে নিম্নোক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করছে।' '৯৬ সালে এসে বলা হচ্ছে, 'বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা দক্ষ গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত করা এবং বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু প্রচারের স্বার্থে নিম্নলিখিত নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করার অনুরোধ করা হলো।' এখানে দুর্নীতিমুক্ত করা, দক্ষতা, গতিশীল, সুষ্ঠু প্রচার- এই কথাগুলো লেখা হয়েছে এই কারণে যে, কাজটা করার সময় আমরা যেন এই কাজগুলো না করি। অভিজ্ঞতা থেকে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে তার কোনোটার সঙ্গে নীতিমালার ভূমিকার কোনো মিল নেই। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, কতোগুলো শব্দ দেয়া আছে যারা এগুলো মানবে না তারাই বিজ্ঞাপন পাবে। একজন বলেছে যে এগুলোকে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা কেন বলা হচ্ছে? আমি তার সঙ্গে একমত। আসলে তো এগুলো মোরদ্যান ওভারগ্রাউন্ড। এদের কারণে অন্যরাই চাপে থাকে। সন্ধ্যাবেলায় ফকিরেরপুলে একটা নিউজের হাট বসে। ১ হাজার টাকায় লিড, ২০০ টাকায় ডাবল কলাম, ১০০ টাকায় সিঙ্গেল কলাম নিউজ কিনতে পাওয়া যায়। মাহফুজ আনাম আজকে অবশ্য বলেননি কিন্তু তার একটা নীতির সঙ্গে আমি একমত। নীতি যত কম থাকে দুর্নীতি

†Mvj‡Uwej Av‡jvPbvi gW¨v‡iUi wQ‡jb GgGgwm0i wbevnx cwiPvjK Kvgi"j nvmvb gÄ

তত কম হয়। আমাদের নীতিও বেশি দুর্নীতিও বেশি। আমিও তাই প্রস্তাবনা দিতে চাই আমাদের কোনো নীতিমালাই থাকার দরকার নেই, বিজ্ঞাপনের। পরশুদিন প্রথম আলোতে দেখলাম ব্যারিস্টার মওদুদ সাহেব বলেছেন, র‍্যাবের কোনো বিশেষ ক্ষমতা নেই কিন্তু স্পেশাল পাওয়ার আছে। আমি এ দুটোর পার্থক্য বুঝি না। সবার অনুমতি নিয়ে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, নীতির সঙ্গে গাইডলাইন বা রুলসের কিছু একটা পার্থক্য আছে। আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে একটা গাইডলাইন থাকতে পারে। ঠাকুরগাঁওয়ের একটা রাস্তার টেন্ডার হবে, তার বিজ্ঞাপন ঠাকুরগাঁওয়ের পত্রিকায় দেয়া যেতে পারে। কিন্তু ঠাকুরগাঁওয়ের কোনো কাজের জন্য যদি ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার হয় তাহলে সেটা অবশ্যই ইংরেজি পত্রিকায় দিতে হবে। এ রকম কিছু গাইডলাইন তৈরি করা যেতে পারে। এতে করে ডিএফপিকে ভেঙে না দিয়েও এই নীতিমালা কার্যকর হচ্ছে কি না সেটি ভেবে দেখা যেতে পারে।

প্রচার সংখ্যা নিয়ে যতই আমরা কথা বলি, এ নিয়ে বিতর্ক ততই বাড়তে থাকবে। আসিফ নজরুল বলেছে প্রচার সংখ্যা নিয়ে পত্রিকার দিক থেকে কোনো মন্তব্য আছে কি না। শুনে অশ্চর্য হবেন যে, আমার পত্রিকার প্রচারসংখ্যা সর্বোচ্চ কি না তা প্রচারের যথেষ্ট কায়দা-কানুন আছে। এজন্য একজন এমপিকে ঠিক করা হয় তিনি সংসদে প্রশ্ন তোলেন, তথ্যমন্ত্রী জবাব দেন। আর আমি তখন বলি যে, তথ্যমন্ত্রী সংসদে বলেছেন আমার পত্রিকা সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা। কাজেই প্রচারসংখ্যা শুধু বাজারে বাড়লে হবে না, এ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট কপি নেয়ার অনেক ফর্মুলা আছে। আমি মনে করি যেমন এবিসি একটা আছে অডিট ব্যুরো অব সাকুলেশন। সংসদে বক্তৃতা দিয়ে যখন একজন মন্ত্রী জানালো একবার অমুক পত্রিকা একনম্বর, অমুক পত্রিকা দু'নম্বর, তখন মতিউর রহমান নিজে লিখেছেন, সাংবাদিক এবং সম্পাদকদের এবিসির সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। এবিসির সহকারী সচিব, উপসচিব কোথায় রাতে থাকবেন, কোথায় কি খাবেন আর পরদিন এসে রিপোর্ট দিবেন সেটা আমরা মানি না। ভারতের সমস্ত পত্রিকার সপ্তাহে একদিন তার প্রচারসংখ্যা দিতে হয়। শহরে কতো, গ্রামে কতো, কোন মেশিনে ছাপা হয়, পত্রিকার সাইজ কতো, প্রিন্ট মিডিয়ার এরিয়া কতোটুকু, বিজ্ঞাপনের এরিয়া কতোটুকু, এ রকম বাংলাদেশেও করা যেতে পারে। কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থার লোকজন করবে তা হতে পারে না। পত্রিকার লোকজনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে আমি আসিফ নজরুলের সঙ্গে একমত। আমি বক্তব্য না বাড়িয়ে সুনির্দিষ্ট করতে চাই যে, বাংলাদেশে একটি আইন আছে যেটি নীতিমালার মধ্যেও আছে। ওয়েজ বোর্ড না মানলে তাকে সরকারি বিজ্ঞাপন দেয়া হবে না। আবার এই অপরাধে মফস্বলের সব পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হোক এ রকম একতরফা নীতিও পছন্দ করি না। এ নীতিমালার মধ্যেও বগুড়ার করতোয়া কিন্তু বেঁচে আছে। পত্রিকাটি সরকারি বিজ্ঞাপন কয় ইঞ্চি প্রায় তার হিসাব কখনোই আমরা নেই না। তথ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে যে হিসাব উপস্থান করেছেন সেই মতে ঢাকার বাইরে সবচেয়ে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া পত্রিকার নাম 'লোকসমাজ'। আপনারা জানেন লোকসমাজ কোথা থেকে বের হয়? এই পত্রিকার মালিক কে? এর মালিক হচ্ছে সাবেক তথ্যমন্ত্রী বর্তমান বন ও পরিবেশ মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম। এটি বের হয় যশোর শহর থেকে। ঢাকায় সর্বোচ্চ বিজ্ঞাপন পেয়েছে দিনকাল। ইত্তেফাক, প্রথম আলো ৫ ও ৬ নম্বরে। আসিফ নজরুল বলেছেন, সাংবাদিকরা দ্বিধাবিভক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দ্বিধাবিভক্ত না

কিন্তু আমরা জানি যখন এক বিবৃতিতে এমাজউদ্দিনের সই দেখি তখন বাকিদের নাম আর পড়তে হয় না। আবার যখন ড. আনিসুজ্জামানের সই দেখি তখনও বুঝি নিচের নামগুলো কারা কারা। আনুষ্ঠানিকভাবে ভাঙেনি কিন্তু এ ভাঙাটা আছে। এখানে গিয়াসকামাল চৌধুরী এক সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, আমি আরেকটির মহাসচিব। আমরা যৌথভাবে বর্তমান সরকারের তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের দাবির ভিত্তিতে সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। সেখানে আমাদের প্রতিনিধি আছে। সরকারের প্রতিনিধি আছে, মালিকদের প্রতিনিধি আছে। তারা যে রিপোর্ট দিয়েছে সে অনুসারে বাংলাদেশে মাত্র ১২টি পত্রিকায় ওয়েজ বোর্ড মানা হয়। বাকিগুলো? কোনো খবর নেই। আমরা তথ্যমন্ত্রীকে বলেছি, এটা আপনাদের রিপোর্ট। একটি পত্রিকা আইন মানে না তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেন। ওয়েজ বোর্ড যে মানে না তার সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করেন। যেটা রুদ্র মাসুদ বলেছে, সে মিডিয়া লিস্টেড হয়নি। কেননা, তার চেয়ে বরং বাইরে থাকাই ভালো। বাইরে থেকে যদি কেউ বের করতে পারে ভালো। আর যদি লিস্টেড থাকতে হয় তাহলে আইনের মধ্যে আসতে হবে, ওয়েজবোর্ড মানতে হবে। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী মালিক সংগঠকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু এই রিপোর্ট প্রকাশও হয় না এবং আদৌ বাস্তবায়িত হবে কি না সন্দেহ আছে। সরকার জানে যে, তাদেরই নীতিমানা সংগঠনগুলো মানছে না। আসিফ নজরুলকে আশ্বস্ত করতে চাই আমরা রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত, কিন্তু পেশাদারিত্বের প্রশ্নে আমরা একমত। আমরা একসঙ্গে আন্দোলন করে ওয়েজ বোর্ড আদায় করেছি। এই সরকার ওয়েজ বোর্ড দেবে বলে নীতিগতভাবে ঘোষণা দিয়েছে। যশোর-খুলনায় যখন সাংবাদিকরা নিহত হয় তখন আমরা একসঙ্গে রাজপথে নেমেছি। আমরা আলাদা ইউনিয়ন করি কিন্তু পেশাগত দায়িত্ব পালনে গিয়াস কামাল চৌধুরী এবং আমার মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। আমাদের এই বিভক্তির জন্য নীতিমালা পরবর্তন বা বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা হবে না বলে আমি সবাইকে আশ্বস্ত করতে পারি। আমি সুনির্দিষ্টভাবে দু-একটি প্রস্তাব তুলে ধরতে চাই। ডিএফপি বিলোপ করে দেয়ার যে প্রস্তাবটি গোলাম মোর্তোজা দিয়েছে আমি মনে করি তা না করে তাদের নামের সঙ্গে যে বিষয়টি রয়েছে তারা সেই কাজটি করুক। ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম এ্যান্ড পাবলিকেশনের কাজ। বিজ্ঞাপনের কাজটি তো তাদের নামের সঙ্গেই মেলে না। সেটা তারা কি করবে? তাহলে এখানে যে প্রস্তাবটি এসেছে ছোট পত্রিকাগুলো কি করবে? পৃথিবীর বহু দেশে আছে, একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকার অর্থ সহায়তা দেয়। দেখা যায় ৩ মাসেই তারা চলার ক্ষমতা অর্জন করে। আমাদের দেশে এই সিস্টেম থাকলে তো কেউই এই ক্ষমতা অর্জন করবে না। সরকারের টাকায় চলতেই থাকবে। পত্রিকা যদি শিল্প হয় তাহলে সরকারের একটা তহবিল করা যেতে পারে। নওয়াব আছে, ডিএসপি আছে, সাংবাদিক ইউনিয়ন আছে, আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে করতে পারি। সাংবাদিকদের জন্য একটি কল্যাণ তহবিল আছে যেটা সরকার ট্রাস্ট গঠন করে দিয়েছে। সাংবাদিকদের যদি কল্যাণ তহবিল থাকতে পারে তাহলে পত্রিকাগুলোরও হতে পারে। তবে আমি যেটা মনে করি, একটি পত্রিকাকে তার নিজস্ব উদ্যোগেই বাঁচতে হবে। নিজস্ব উদ্যোগে বাঁচতে না পারলে যার কাছ থেকে সাহায্যটা নেবে তার পক্ষে কাজ করতে হবে। এরশাদ ভাই যেটা বলেছেন, সরকার মনে করে ছোট পত্রিকাগুলোকে যদি বিজ্ঞাপন না দেই তারা মরে যাবে আর বড় পত্রিকাকে যদি বিজ্ঞাপন না দেই তাহলে তারা আমাদের বিপক্ষে যাবে। অনেক বড় পত্রিকা কিন্তু সরকারের বিজ্ঞাপন নিতেও চায় না। কাজেই ঢাকার বড় ৪টি পত্রিকাকে সরকার বিজ্ঞাপন দিক আর না দিক তাদের চরিত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না। আর সবগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাকে যদি সরকার বিজ্ঞাপন দেয়, এবং সবগুলো মিলেও যদি সরকারের পক্ষে যায় তাহলেও বড় পত্রিকার প্রভাবের পাশে তারা দাঁড়াতে পারবে না। এতে করে সরকার হয়তো তার দলের একজনকে এবং তার পত্রিকাকে সাহায্য করছে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়ে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে কোনো সরকারই পারেনি। কারণ যেসব মিডিয়া গণমানুষকে টানতে পারে, তারা সরকারের ওপর নির্ভর করে না। এটা সরকারের বোঝা উচিত। তাই আমি মনে করি পত্রিকা ও সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে এবিসি গঠন করা উচিত। আসিফ নজরুল যেটা প্রস্তাব করেছে প্রতি সপ্তাহে পত্রিকাগুলো তাদের প্রচার সংখ্যার ঘোষণা দিতে পারে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, গ্রামীণফোন এসব বড় বড় কোম্পানি পক্ষে ভারতের একটি বড় রিসার্চ কোম্পানির কাজ করে। সরকার এ রকম কোনো কোম্পানিকে দায়িত্ব দিতে পারে। সেই অনুসারে বিজ্ঞাপন বণ্টন করা যেতে পারে। ঠাকুরগাঁও বা গলাচিপার আসামির খবর ঐ এলাকার পত্রিকায় ছাপা উচিত, ঢাকার পত্রিকায় না। এ রকম কিছু গাইডলাইন তৈরি করা যেতে পারে। আরেকটি প্রশ্ন উঠেছে, পত্রিকাগুলো যে বিজ্ঞাপন পায় সরকারকে তার হিসাব দেয়া হয় কি না। অবশ্যই দেয়া হয়, কেননা, পত্রিকাগুলোকে ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করতে হয়। হিসাবগুলো সত্য কি মিথ্যা জানি না, তবে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপনের হিসাব দিতে হয়। এই প্রশ্নগুলো আসার কারণ গোলাম মোর্তোজার প্রবন্ধে বিস্তারিত আছে। মাহফুজ আনাম যে বিষয়টি বলেছেন উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে, এ বিষয়টিকে আমি আরো সুস্পষ্ট করে বলতে চাই, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে দুর্নীতি তা শুরুই হয় পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। একটি ছোট পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় যেটা ঠিকাদারদের চোখেই পড়ে না। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বছরের পর বছর ধরে আমরা যে দুর্নীতির হিসাব করি তা শুরু হয় এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ৩টি। প্রথমটি হচ্ছে, এরশাদ ভাই যেটা বলেছে প্রাইভেট বডি এবং প্রফেশনাল বডির সমন্বয়ে একটি কমিটি হতে পারে। বিজ্ঞাপনের নীতিমালা বলতে কোনো নীতিমালা থাকার দকার নেই, একটি গাইডলাইন রাখা যেতে পারে। শামীম রেজা বলেছেন, তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের পাবলিক রিলেশন পড়ান। কিন্তু এই ডিএফপির কারণে সরকারের কোনো পাবলিক রিলেশন নেই। একজন পাবলিক রিলেশন অফিসার সারা বছর বিভিন্ন সুবিধা নেবেন পত্রিকা থেকে কিন্তু কোনো বিশেষ দিনে তিনি বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন না। বিজ্ঞাপন দেবে ডিএফপি। এরশাদ ভাই যেমন বললো, বিশেষায়িত পত্রিকার অভাব, বিভিন্ন বিষয়ের পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় না। এসব বিষয় প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। তাই নীতিমালা নয়, গাইড লাইনটাই কার্যকর হবে। সর্বশেষ যে বিষয়টি আমি বলতে চাই, যেকোনো সরকারের ক্ষেত্রেই রাজনীতি যদি প্রাধান্য পায় তাহলে শুধু বিজ্ঞাপন নীতি না, কোনো নীতিই বাস্তবায়িত হবে না। আমাদের দেশে তো নীতি কার্যকরের প্রধান উপায় হচ্ছে আমার দলের নীতি এবং দলের মানুষকে খুশি করা। দেশের স্বার্থ ভাবা গেলে নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব। সবাইকে ধন্যবাদ।

মঞ্জু : ধন্যবাদ মঞ্জরুল আহসান বুলবুলকে। অত্যন্ত চমৎকার গঠনমূলক, বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য এবং সুপারিশ প্রদান করার জন্য। আমরা বিশ্বাস করি তার বক্তব্য আমাদের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা দেবে এবং সেগুলো সামনে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। এখন বক্তব্য রাখবেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী।

গিয়াস কামাল চৌধুরী : কামরুল হাসান মঞ্জু যিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে একটি সময়োচিত বিষয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হতে সাহায্য করেছেন এবং যিনি প্রবন্ধটি লিখেছেন তাকে অর্থাৎ গোলাম মোর্তোজাকে ও তাদের সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে,

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবকে সালাম জানিয়ে দুটি কথা বলবো। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে সংবিধান আমরা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছি তার ৩৯ নং অনুচ্ছেদে অত্যন্ত সুন্দর একটি কথা রয়েছে- চিন্তার স্বাধীনতা। প্রজাতন্ত্র এখানে ওয়াদা করেছে। তাই আমরা চিন্তা ক্ষেত্রে স্বাধীন। জাপান ছাড়া পৃথিবীর অপর কোনো দেশের সংবিধানে এ রকম স্বাধীনতার কথা উল্লেখ নেই। আমাদের সাংবাদিকদের দু'টি ফেডারেশন হয়তো চিন্তায় ভিন্ন মতাদর্শ ধারণ করি কিন্তু ঝগড়া করি না। যে বিষয়টি বুলবুল জোর দিয়ে বলেছে তাই বুলবুলকে ধন্যবাদ। অনেক সংবাদপত্র থাকতে পারে। মাও সেতুং বলেছেন শত ফুল ফুটতে দাও। তাই আমাদের এখানে যদি অনেক পত্রিকা বিকশিত হয় হোক। এখানে যেসব আলোচনা হয়েছে আমি তা সমর্থন করি। তবে একটা কথা আমি বলবো, লুটেপুটে খাওয়া কোনো নীতি হতে পারে না। ১৯৫০ সালে ভারতে জওহরলাল নেহরু প্রেস কমিশন অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রেস কমিশনের মাধ্যমে ভারতে একটি সুন্দর সংবাদপত্র জগৎ তৈরি হয়েছে। এই দাবি আমরা যখন যে সরকার আসছে তার কাছেই ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পেশ করেছি কিন্তু কাজ হয়নি। অথচ আমাদের সবার কাছে স্বৈরাচার হিসেবে পরিচিত এরশাদ একটি প্রেস কমিশন গঠন করেছিলেন মরহুম আতাউর রহমানকে সচিব করে। আমি আজকে এই অনুষ্ঠান থেকে নতুন একটি প্রেস কমিশনের দাবি করছি।

মঞ্জু : গিয়াস কামাল চৌধুরীকে ধন্যবাদ। এখন আমি বক্তব্যের জন্য অনুরোধ করবো আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, আমাদের সবার শ্রদ্ধাভাজন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে। তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হবে।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : আমি খুবই আনন্দিত এবং উপকৃত হয়েছি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে। আমি মাসলাইন মিডিয়া সেন্টার এবং সাপ্তাহিক ২০০০কে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। গোলাম মোর্তোজা তার প্রবন্ধে যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছে তাতে অনেকগুলো বিষয় উন্মোচিত হয়েছে। সংবাদপত্রের এবং সাংবাদিকতার গুরুত্ব আমরা জানি, কিন্তু সংবাদপত্রের পেছনে প্রাণপ্রাবাহের কাজ করে যে বিষয়টি তা হলো বিজ্ঞাপন। সে ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটছে তার চিত্র এখানে উন্মোচিত হয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য কি? সংবাদপত্রের মালিকদের কর্তব্য কি? এছাড়া পত্রিকার বাইরে যারা আছে তাদের কর্তব্য কি? এ প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে বিজ্ঞাপনের চিত্র উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। আমরা বাইরে থেকে যতোটা ধারণা করেছি তারচেয়ে বিপজ্জনক চিত্র পাওয়া গেছে। যেসব নাম আছে পত্রিকাগুলোর এগুলো তো আমরা কখনো শুনিনি, এসব নাম হতে পারে ভাবিনি। কিন্তু 'আজকের পদ্ম' কতো সৃজনশীল নাম। আজকের অমৃত বাজার, খোলাবাজার, একটার নাম দেখা যাচ্ছে অজানা, অর্থাৎ নাম কোনো ব্যাপার না, একটা হলেই হলো। আমার মনে হয় বিষয়গুলো প্রচার করা দরকার। প্রচার করলে মানুষ বুঝবে কি হচ্ছে বিজ্ঞাপনের নাম করে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না ছাপিয়ে পত্রিকার লোগো ফটোকপি করে করে তা দাখিল করা হচ্ছে। এ ধরনের ভয়ঙ্কর উদ্ভাবনশীল ঘটনা আমরা দেখেছি। আমরা এটাও বুঝলাম সংবাদপত্রের বেঁচে থাকার জন্য বিজ্ঞাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিজ্ঞাপন যে দেশের উন্নয়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ সেই সত্যটাও আমরা দেখলাম। টেন্ডার হচ্ছে লোকে জানছেনা, মফস্বলের বিজ্ঞাপন মফস্বলে ছাপাচ্ছে না- এতে শুধু সংবাদপত্রের ক্ষতি হচ্ছে না, ক্ষতি হচ্ছে জাতির, ক্ষতি হচ্ছে অর্থনীতির এবং সেই ক্ষতির কথাটাও এখানে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারেও না জানিয়ে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। নীতির ব্যাপারগুলো জানানো হয় না। এটা শুধু বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আলাদা নয়, বাংলাদেশ যে দুর্নীতির শীর্ষে আছে তার অনেকগুলো স্তর আছে। আমরা সরকারের কথা জানি, পুলিশের কথা জানি আর আজ সংবাদপত্রের কথা জানলাম। তাই এ বিষয়টি প্রমাণ হয়ে গেলো যে দেশের সর্বত্র দুর্নীতি চলছে। বাংলাদেশের যে সাধারণ নীতি তা হলো লুণ্ঠণের, তা এখানেও আছে। আমাদের সমাজে যে শাসক শ্রেণী তৈরি হয়েছে তাদের সংঘর্ষ আজকের রাজনীতি। যে সরকার যখন ক্ষমতায় আসছে তখন তারা বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করছে। আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা আর সিন্ডিকেটের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। এগুলো তো সবই আমাদের সমস্যা, এখন আমরা কি করতে পারি?

আমাদের যে আলোচনা, এই অনুষ্ঠানের মূল কাজটা হচ্ছে জনমত তৈরি করা। জনমত সৃষ্টির জন্য আমরা লিখবো। দায়িত্ব আছে সংবাদপত্রের মালিকদের, দায়িত্ব আছে সাংবাদিকদের। মালিকরা একত্রিত হয়ে চাপ প্রয়োগ করবে। সার্কুলেশন এবং ওয়েজ বোর্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো উঠে এসেছে। মালিকদের দায়িত্ব সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষা করা। বাংলাদেশে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হচ্ছে সাংবাদিকতা। ইউনিয়ন গঠন করে সাংবাদিকদের একতাবদ্ধ হতে হবে। তারা বলেছে তাদের মধ্যে ঐক্য আছে। হ্যাঁ, এটা আমরা লক্ষ করি। যখন সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন আসে তখন তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। কিন্তু আমরা এটাও মনে করি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা দরকার। এই সংবাদিকদের কাছ থেকেও মানুষ দৃষ্টান্ত চায়। সংবাদপত্র তো সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। আমরা আদালতের কাছে যেতে পারি না। কেননা, সুবিচার পাব বলে আশা করছি না। আজকে যে সরকারই আসুক স্বৈরাচারে পরিণত হয়। সে ক্ষেত্রে সংবাদপত্র মানুষের দুর্দশার কথা, অধিকারের কথা তুলে ধরছে। এ রকমভাবে অন্য ক্ষেত্রেও তাদের কাছে আমরা দৃষ্টান্ত আশা করবো, ঐক্য আশা করবো। মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সরকারি বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি বেসরকারি বিজ্ঞাপন যে আছে এটা একটা ভালো খবর। এটা থাকার ফলেই সংবাদপত্র কিছুটা স্বাধীনতা উপভোগ করছে। কেবল যদি সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করতে হতো তাহলে প্রথম শ্রেণীর অনেক সংবাদপত্র টিকতো না। একটা বড় প্রশ্ন যেটা মোর্তোজা প্রবন্ধের শেষে বলেছে, ডিএফপি থাকার দরকার আছে কি নেই? বুলবুল যেটা বলেছে ডিএফপির যে কাজ তারা সেটা করুক কিন্তু বিজ্ঞাপনের বিতরণ তাদের করা উচিত না।

আমরা একটা দুর্নীতির সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস করছি। তাই কোনো ব্যবস্থাই আমাদের কার্যকর হবে না। বিকেন্দ্রীকরণ একটা ভালো পদক্ষেপ হতে পারে বলে আমার মনে হয়। এটা অনেক বেশি জরুরি এখন। প্রচার সংখ্যা নির্ধারণের জন্য একটি বডি গঠনের প্রস্তাব উঠেছে, সেটা করা যেতে পারে। এবং আমি এটাও মনে করি, স্থানীয় পত্রিকা ও বিশেষ ধরনের পত্রিকার দরকার আছে। শিল্প পত্রিকা হোক, সাহিত্যের হোক, কৃষ্টি হোক তাদের রক্ষা করতে হবে। নতুন যে সুপারিশনামা আসবে সেখানে এ ধরনের পত্রিকাগুলোকে যেন বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এ বিষয়গুলো থাকা দরকার। আপনাদের ধন্যবাদ অনেকগুলো বিষয় জানা গেলো যেগুলো আমরা জানতাম না। করণীয়গুলোও আলোচিত হলো। এখন এগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এটা আপনারাই ভালো পারবেন। যেটা আমরা চাই সেটা যেন চাপ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অর্জন করা যায়। আপনাদের সবাইকে এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মঞ্জু : সাপ্তাহিক ২০০০ এবং মাস্‌লাইন মিডিয়া সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি।

গ্রন্থনা : মহিউদ্দিন নিলয় ও মারুফ রনি

ছবি : **তুহিন হোসেন ও সালাউদ্দিন টিটু**